কানু কহে রাই

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

দুই টাকা আট আনা

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ— ১৩৬২

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

—প্রণীত—

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থরাজি

—গল্প ও উপন্যাস—

কানু কহে রাই	২॥০
গৌড়মল্লার	৪৲
কালের মন্দিরা	৩॥০
কালকূট	২॥০
কাঁচামিঠে	২॥০
ছায়াপথিক	৩৲
শাদা পৃথিবী	৩৲
বিষকন্যা	২॥০
ঝিন্দেরবন্দী	৩৲
পঞ্চভূত	২॥০

—ডিটেকটিভ উপন্যাস—

দুর্গরহস্য	৩॥০
ব্যোমকেশের গল্প	২॥০
ব্যোমকেশের কাহিনী	১॥০
ব্যোমকেশের ডায়েরী	১॥০

—চিত্র-নাট্য—

বিজয়লক্ষ্মী	২॥০
কালামাছি	২॥০
যুগে যুগে	২॥০
পথ বেঁধে দিল	২॥০

—নাটক—

বন্ধু	১৸০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা৬

কানু কহে রাই

ছোটনাগপুরের একটি বড় সহর হইতে যে পাকা রাস্তাটি ষাট মাইল দূরের অন্য একটি বড় সহরে গিয়াছে সেই রাস্তা দিয়া একটি মোটর গাড়ী চলিয়াছে। শীতান্তের অপরাহ্ণ, বেলা আন্দাজ তিনটা। রাস্তার দুপাশে অসমতল জঙ্গল, কোথাও ঘন কোথাও বিরল, দূরে দূরে পাহাড়ের ন্যুব্জপৃষ্ঠ দেখা যায়। দৃশ্যটি নয়নাভিরাম, বাতাসের আতপ্ত শুষ্কতা স্পৃহণীয়।

মোটর মন্দগতিতে চলিয়াছে, ত্বরা নাই। স্টীয়ারিঙের উপর দুই অলস বাহু রাখিয়া মোটর চালাইতেছে একটি যুবতী। পরিণত-যৌবনা, বয়স অনুমান পঁচিশ। মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের উপর প্রসাধনের নৈপুণ্য মুখখানিকে আরও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। চোখে হরিদাভ মোটর-গগ্‌ল্‌, পরিধানে কাশ্মীরী পশমের শাড়ী ও ব্লাউজ। সর্বোপরি সর্বাঙ্গ জড়াইয়া একটি আমন্থর আত্ম-প্রসন্নতা।

যুবতীর নাম মমতা। মোটর যে-শহরের দিকে চলিয়াছে, সেই শহরের ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ভৌমিক তাহার স্বামী। সে যে-শহর হইতে ফিরিতেছে সেখানে তাহার মামার বাড়ী, সে মামার বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্য বেড়াইতে গিয়াছিল, এখন স্বামিগৃহে ফিরিতেছে।

তাহার পাশে বসিয়া আছে তাহার মামাতো বোন সতী। বয়সে তাহার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট, দেখিতে তাহার মত সুন্দরী নয়, কিন্তু শ্রী আছে। চোখদুটি চপল, অধর চটুল; সহজেই হাসিতে পারে। বেশ-

ভূষার বিশেষ পার্থক্য নাই, প্রসাধনের মধ্যে ভ্রূর মাঝখানে সিঁদুরের টিপ, গালে রুজের একটু আভাস। সতীর বাবা লণ্ডনে হাই কমিশনারের অফিসে বড় চাকুরে; সতী সেই সূত্রে দুই বছর বিলাতে ছিল, সম্প্রতি ফিরিয়াছে। বর্তমানে সে মমতার সঙ্গে ভগিনীপতির গৃহে বেড়াইতে যাইতেছে।

গাড়ীতে আর কেহ নাই। পিছনের আসনে দুজনের ফার্ কোট, হ্যাণ্ড ব্যাগ, দুটা বিলাতী কম্বল; গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে খোলের মধ্যে দুটা স্যুটকেস ইত্যাদি।

গাড়ী স্বচ্ছন্দ গমনে চলিয়াছে। দুই বোনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে; সতীই বেশী কথা বলিতেছে, মমতা সায় উত্তর দিতেছে।

সতী একসময় বলিল—'আমিই কেবল বলে চলেছি, তুই চুপটি করে আছিস। এবার তুই কথা বল, আমি শুনি।'

মমতা আলস্যভরে বলিল—'আমার বলার কিছু থাকলে তো বলব। তুই দু'বছর বিলেতে থেকে এলি, কত নতুন জিনিস দেখলি, তা বিলেতের কথা তো কিছুই বলছিস না।'

সতী বলিল—'কি বলব? বিলেত দেশটা মাটির, মানুষগুলো আমাদেরই মত, কেবল রঙ্ কটা।'

'আর কিছু বলবার নেই?'

'বলবার অনেক আছে, কিন্তু সেগুলো প্রশংসার কথা নয়। বিচ্ছিরি দেশ ভাই, আমার একটুও ভাল লাগেনি। এত মানুষ চারিদিকে যে মনে হয় যেন গিজগিজ করছে, একটু নিরিবিলি নেই কোথাও।'

'তা সভ্য দেশে মানুষ থাকবে না তো কি বাঘ ভালুক থাকবে? আমি তো বাপু মানুষ না হলে একদণ্ড টিকতে পারিনা, প্রাণ পালাই পালাই করে।'

সতী হাসিল—'তোর কথা আলাদা, তুই হলি সভ্য মানুষ। আমি

একটু জংলি আছি। মানুষের সঙ্গ যে একেবারে ভাল লাগেনা তা নয়, কিন্তু নিরিবিলিও চাই। এই ত্যাখ দেখি কি সুন্দর দেশের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি। কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই; মাথার ওপর সূর্য, মিঠেকড়া বাতাস, চারিদিকে জঙ্গল। এমন দৃশ্য বিলেতে কোথাও নেই।'

মমতা বলিল—'গরম পড়ুক তখন এ দৃশ্যের চেহারা বদ্‌লে যাবে।'

সতী বলিল—'তা বদ্‌লাক। মাগো, বিলেতে কি ঋতু বলে কিছু আছে? শুধু হাড়ভাঙা শীত আর পচা বর্ষা। ত্যাখ দেখি আমাদের দেশ! শীত গেলেন তো এলেন ঋতুরাজ বসন্ত। তারপর এলেন গ্রীষ্ম, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দশদিক শুদ্ধ করে নিলেন। গ্রীষ্মের পর বর্ষা এসে সব কালিঝুলি ধুয়ে দিয়ে গেলেন। অমনি এলেন সোনার শরৎ, তারপর হিমের আমেজ নিয়ে হেমন্ত। তারপর আবার শীত। কী সুন্দর বল দেখি, যেন ছটা ঋতু এস্রাজের তারের ওপর সারে গামা সাধছে।'

মমতার ঠোঁটের কোণ একটু অবনত হইল—'তোর কবিত্ব রোগ এখনও সারেনি দেখছি।'

সতী হাসিয়া উঠিল—'ও সারবার নয়। কিন্তু সত্যি বলছি দিদি, বিলেতে দু'বছর ছিলুম, একটাও কবিতা লিখিনি। যখন বড্ড মন খারাপ হত তখন ঘরে দোর বন্ধ করে গান গাইতুম।'

'কি গান গাইতিস্?'

'গাইতুম—ধনধান্যপুষ্পভরা—, গাইতুম—কোন্ দেশেতে তরুলতা—, গাইতুম—কানু কহে রাই—'

মমতা চকিত বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল—'কানু কহে রাই—?'

সতী হাসি-ভরা মুখে খানিক মমতার পানে চাহিয়া রহিল, তরলকণ্ঠে বলিল—'হাঁ।—কেন, ও গান কি বিলেতে গাইতে নেই?'

মমতা একটু গম্ভীর হইয়া রহিল, শেষে বলিল—'যা বলিস, গানটা কেমন যেন চাষাড়ে গোছের।'

সতী বলিল—'তা তো হবেই। চণ্ডীদাস যে চাষা ছিলেন। ধোপানীকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই করেছিলেন। কিন্তু গানটি ভারি মিষ্টি ভাই।'

'আমার একটুও ভাল লাগেনা। ড্রয়িং রুমে ও গান চলে না।' একটু নীরব থাকিয়া বলিল—'ওই গান গেয়েছিল বলে একজনকে বিয়ে করিনি।'

সতীর চোখে উত্তেজনাপূর্ণ কৌতূহল নৃত্য করিয়া উঠিল—'ওমা, তাই নাকি! আমি তো কিছু জানিনা। বিলেত যাবার মাস কয়েক পরে খবর পেলুম তোর বিয়ে হয়েছে। কী হয়েছিল বলনা ভাই।'

মোটর একটানা গুঞ্জন করিতে করিতে চলিয়াছে। মমতা ত্বরাহীন কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—'দু'বছর আগেকার কথা, তুই তখন সবে বিলেত গিয়েছিস। কলকাতার বাড়ীতে রোজ সন্ধ্যেবেলা চার পাঁচটি যুবা পুরুষের আবির্ভাব হয়, কেউ মিলিটারি ক্যাপ্টেন, কেউ সিভিলিয়ান, কেউ শুধুই অভিজাত-বংশের ছেলে। আমার কিন্তু কাউকেই ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। বাবার ইচ্ছে ক্যাপ্‌টেন্‌টিকে বিয়ে করি, মা'র ইচ্ছে চীফ্‌-সেক্রেটারীর অ্যাসিষ্টাণ্ট্‌কে। আমি কিছু ঠিক করতে পারছি না; এমন সময় একজন এলেন। নতুন লোক, কলকাতায় থাকেন না, মাঝে মাঝে আসেন। শিক্ষিত, চেহারা ভাল, দেখে মনে হয় সিভিলাইজ্‌ড্‌ মানুষ। নাম মৌলিনাথ।'

সতী বলিল—'তুই বুঝি প্রেমে পড়ে গেলি?'

মমতা বলিল—'একটু একটু।'

সতী বলিল—'প্রেমে আবার একটু একটু পড়া যায় নাকি?'

'যায়। মনের জোর থাকা চাই।—তারপর শোন। বেশ ভাব হয়ে গেল। মা বাবারও পছন্দ। বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেল। একদিন বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, মা'র ইচ্ছে ডিনারের পর এন্‌-গেজমেণ্ট অ্যানাউন্স্‌ করবেন। ডিনারের আগে ড্রয়িংরুমে সবাই জড়ো হয়েছে। একজন অতিথি প্রশ্ন করলেন—মৌলিনাথবাবু, আপনি গান গাইতে জানেন? তিনি বললেন—জানি সামান্য। সবাই ছেঁকে ধরল, একটা গান করুন। তিনি বললেন—আমি পিয়ানো বাজাতে জানিনা, সাদা গলায় গাইছি। এই বলে মেঠো সুরে গান ধরলেন—কানু কহে রাই!'

সতী কৌতুক-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল—'তারপর?'

'আমার মাথায় বজ্রাঘাত। অতিথিরা গা টেপাটেপি করে হাসছে। এ যেন একটা বোষ্টম ভিকিরি ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়েছে। আমি মা'কে গিয়ে বললুম, আজ এন্‌গেজমেণ্ট্‌ অ্যানাউন্স্‌ কোরো না।—মৌলিনাথ-বাবু বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। ডিনারের পর আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। আমার এখন যে রূপ দেখছেন এটা আমার ছদ্মবেশ, আসলে আমি অসভ্য মানুষ, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। শহরে লোকজনের মধ্যে বেশী দিন থাকতে পারি না। আমাকে যিনি বিয়ে করবেন তাঁকে বনে জঙ্গলেই থাকতে হবে। আমি বললুম, তাহলে এক কাজ করুন, একটি সাঁওতালের মেয়ে বিয়ে করুন। তিনি বললেন—আপনি ঠিক বলেছেন, আচ্ছা নমস্কার। —বলে সোজা বেরিয়ে চলে গেলেন।'

সতী বলিল—'ভারি আশ্চর্য মানুষ তো! তারপর আর ফিরে আসেন নি?'

মমতা বলিল—'না! এলেও আমি দেখা করতুম না। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে ইনি এলেন।'

'ইনি কে? ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব?'

'হ্যাঁ। এক মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল।'

সতী একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—'নাটক বিয়োগান্ত কি মিলনান্ত বুঝতে পারছি না। দিদি, তোর মনে একটুও আপ্‌সোস নেই?'

মমতা দৃঢ় ওষ্ঠাধরে বলিল—'একটুও না। আমি যা চেয়েছি হাজারটার মধ্যে তাই বেছে নিয়েছি।'

সতী কিছুক্ষণ বিমনা থাকিয়া বলিল—'ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবকে ভালবাসিস?'

মমতা বলিল—'স্বামীকে যতটা ভালবাসা উচিত ততটা ভালবাসি। আর কি চাই?'

কিছুক্ষণ আর কোনও কথা হইল না। গাড়ী চলিয়াছে। সূর্যের রঙ্‌ ঘোলা হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

হঠাৎ মোটরটা গোলমাল আরম্ভ করিল। এতক্ষণ বেশ অনাহতছন্দে চলিয়াছিল, এখন দু'চার বার হেঁচ্‌কা দিয়া চলিতে চলিতে শেষে ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দুই বোন শঙ্কিত দৃষ্টি বিনিময় করিল।

সতী বলিল—'এই মজিয়েছে।'

গাড়ীকে সচল করিবার চেষ্টা সফল হইল না। মমতা বলিল—'বোধহয় কারবুরেটারে ময়লা ঢুকেছে।

সতী বলিল—'স্পার্কিং প্লাগ্‌ও হতে পারে।'

মমতা জিজ্ঞাসা করিল—'তুই মেরামতের কিছু জানিস্?'

'কিছু না। তুই?'

'আমিও না। সব দোষ ওই হতভাগা ওসমানের! ওকে বলে

দিয়েছিলুম গাড়ীর কলকব্জা সব দেখেশুনে রাখতে, তা এই করেছে! দাঁড়াও না, আজ বাড়ী গিয়েই তাকে বিদেয় করব।'

'সে তো পরের কথা। এখন বাড়ী পৌঁছুবার উপায় কি?' সতী গাড়ী হইতে নামিল।

মমতা বলিল—'উপায় তো কিছু দেখছি না। এক যদি এ রাস্তায় মোটর যায় তবে লিফ্‌ট পাওয়া যাবে। কিন্তু এ রাস্তায় যে ছাই মোটরও বেশী চলে না।'

মমতা গাড়ী হইতে নামিল, চশ্‌মা খুলিয়া অত্যন্ত বিরক্তভাবে চারিদিকে চাহিল।

'জঙ্গলের মধ্যে আজ রাত কাটাতে হবে দেখছি।'

সতী প্রশ্ন করিল—'শহর এখান থেকে কত দূর?'

মমতা মাইল মিটার দেখিয়া হিসাব করিয়া বলিল—'দশ-এগারো মাইল।'

সতীর চোখে একটা নূতন আইডিয়ার ছায়া পড়িল, সে বলিল—'দশ-এগারো মাইল! তা আয় না এক কাজ করি। এখনও বেলা আছে, এখন থেকে হাঁটতে সুরু করলে সন্ধ্যে হতে হতে শহরে পৌঁছে যাব। কি বলিস?'

মমতা রাস্তার ধারে একটা পাথরের চ্যাঙড়ের উপর বসিয়া পড়িল—'আমাকে কেটে ফেললেও আমি এগারো মাইল হাঁটতে পারব না।'

সতী আর একটা চ্যাঙড়ের উপর বসিল—'তবে তো মুস্কিল। অন্য মোটর যদি না আসে এইখানেই রাত্রি বাস করতে হবে। জঙ্গলে নিশ্চয় বাঘ ভাল্লুক আছে, আমাদের গন্ধ পেয়ে বেরিয়ে আসবে। নাঃ, আজ বেঘোরে প্রাণটা গেল।'

মমতা দুহাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। সতী ছটফট করিয়া

বেড়াইতে লাগিল। একবার উঠিয়া একবার বসিয়া মোটরের কলকব্জা নাড়া-চাড়া করিয়া অবশেষে আবার চ্যাঙড়ে আসিয়া বসিল।

'দিদি, তোর ক্ষিদে পায়নি ?'

মমতা মুখ তুলিল—'তেষ্টা পেয়েছে।'

'আমার পেট চুঁই চুঁই করছে। সঙ্গে খাবার কিছু আছে নাকি ?'

'উঁহু। মামীমা দিতে চেয়েছিলেন, নিলুম না। ভেবেছিলুম চারটের মধ্যে বাড়ী পৌঁছে চা খাব।'

'হুঁ।' সতী বনের পানে চাহিয়া রহিল।

দশ মিনিট এইভাবে কাটিবার পর সতী হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—'ও দিদি, দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌—ধোঁয়া !'

মমতা চোখ তুলিল। বনের মধ্যে আন্দাজ সিকি মাইল দূরে তরুশ্রেণীর মাথায় ধোঁয়ার একটা স্তম্ভ ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে।

সতী বলিল—'নিশ্চয় ওখানে সাঁওতালদের বস্তি আছে।—চল যাই। আর কিছু না হোক জল তো পাওয়া যাবে।'

মমতা বলিল—'যদি বস্তি না হয় ! যদি জঙ্গলে আগুন লেগে থাকে ?'

'দূর ! আগুন লাগলে কি অমন তালগাছের মতন সোজা ধোঁয়া ওঠে। আয়—আয়—'

'কিন্তু—মোটর এখানে পড়ে থাকবে ?'

'তোর ভাঙা মোটর কেউ চুরি করবে না। আয়।'

'এখনি কিন্তু ফিরে আসব। রাত্তিরে আমি বনের মধ্যে থাকছি না। মোটরের কাঁচ তুলে সারা রাত্তির বসে থাকব সেও ভাল।'

'ভাবিস্‌ নি একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।'

দুজনে গাড়ীর ভিতর হইতে হ্যাণ্ডব্যাগ লইয়া গাড়ী লক করিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বন ক্রমশ ঘন হইয়াছে বটে কিন্তু অন্ধকার

নয়। জমি উঁচু নীচু এবং শিলামিশ্রিত, মাঝে মাঝে নালার মত খাঁজ পড়িয়াছে। দশ মিনিট হাঁটিবার পর তাহারা ধোঁয়ার উৎস মুখে উপস্থিত হইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইল।

সাঁওতালদের বস্তি নয়। একটি মাত্র গৃহ। তাহাও এমন বিচিত্র যে মনে হয় ব্রহ্ম বা শ্যামদেশের জঙ্গলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বিঘাখানেক মুক্ত স্থান বড় বড় মহীরুহ দিয়া বেষ্টিত। মাঝখানে চত্বরের মত একটি প্রস্তরপট্ট। প্রস্তরপট্টের সম্মুখে কয়েকটি ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের মাথা কাটিয়া কেবল স্তম্ভের মত কাণ্ডগুলিকে রাখা হইয়াছে, সেই স্তম্ভগুলির মাথায় কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো একটি ঘর। ঘরটি মাটি হইতে দশ-বারো হাত উচ্চে, মই দিয়া উঠিতে হয়। মইটি ঘরের দ্বারের সম্মুখে লাগানো আছে।

ঘরে জনমানব আছে বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু প্রস্তরপট্টের উপর আগুন জ্বলিতেছে, তার উপর পাথরের ঝিঁকে বসানো একটি প্রকাণ্ড জলের কেট্‌লি।

সতী কিছুক্ষণ চক্ষু গোলাকার করিয়া দেখিল, তারপর করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল—'দিদি! হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? জাপানী রূপকথা! আমরা এক দৈত্যের আস্তানায় এসে পড়েছি। দেখছিস না কত বড় কেট্‌লিতে চা গরম হচ্ছে।'

মমতা বলিল—'হুঁ। কিন্তু দৈত্যটি কোথায়?'

সতী বলিল—'নিশ্চয় মানুষ শিকার করতে গেছে, চায়ের সঙ্গে খাবে। কিম্বা—হয়তো জাপানী দৈত্য নয়, আমাদের কুম্ভকর্ণ; ঘরে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।—দেখব নাকি?'

সতী উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছে, অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া মইয়ের সাহায্যে তর্ তর্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল; মইয়ের সর্বোচ্চ

ধাপে উঠিয়া দ্বারের ভিতর উঁকি দিয়া সে কলকূজন করিয়া উঠিল—'ও দিদি, শিগ্‌গির আয়, দেখবি আয় কি সুন্দর সাজানো ঘর।'

মমতা মইয়ের নীচে হইতে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল—'কেউ আছে নাকি?'

'কেউ না।' মমতা তবু ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া বলিল—'তোর কি মই বেয়ে উঠতে ভয় করছে নাকি?'

মমতা আর দ্বিধা করিল না, উপরে উঠিল। দুই বোন ঘরে প্রবেশ করিল।

টঙের উপর ঘরটি সমচতুষ্কোণ। তক্তার মেঝে, তক্তার দেয়াল। তিনটি দেয়ালে জানালা। মেঝের একপাশে বিছানা, বিছানার পাশে ভালুকের চামড়ার উপর কয়েকটি বই। ঘরের অন্য পাশে দেয়াল ঘেঁষিয়া সারি সারি গৃহস্থালীর দ্রব্য সাজানো; বড় বড় টিনে চাল ডাল, একটি জলের কলসী, থালা বাটি গেলাস; চায়ের প্যাকেট, বিস্কুটের টিন, প্রাইমাস্ স্টোভ্, হ্যারিকেন লণ্ঠন ইত্যাদি। দেয়ালের গায়ে সমতল ভাবে টাঙানো একটি রাইফেল ও একটি ছর্‌রা বন্দুক। পরিমিত আরাম ও নিরাপত্তার সহিত জঙ্গলে বাস করিতে হইলে সভ্য মানুষের যাহা যাহা প্রয়োজন সবই আছে।

চমৎকৃত চক্ষে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে সতী বলিল—'কি সুন্দর ঘর দিদি! আমার যদি এমন একটা ঘর থাকত আমি রাতদিন এই ঘরেই থাকতুম, একটিবার নীচে নামতুম না।'

মমতা কহিল—'জলের কলসী রয়েছে দেখছি, একটু খেলে হত।'

'খা না।—এই নে।' কলসী হইতে জল গড়াইয়া সতী মমতাকে দিল, তারপর বিস্কুটের টিন হইতে একমুঠি বিস্কুট লইয়া একটিতে কামড় দিল, অন্য বিস্কুটগুলি মমতার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—'খাসা বিস্কুট্—এই নে।'

মমতা বলিল—'পরের বিস্কুট না ব'লে খেতে নেই, রেখে দে।'

সতী বলিল—'তোর সব তাতেই আদব কায়দা। গৃহস্বামী যত বড় দৈত্যই হোন, দুটি অভুক্ত অতিথিকে নিশ্চয় খেতে দিতেন। নে—খা। (মমতা একটি বিস্কুট লইল) আয় বসি।'

'বসব কোথায় ? চেয়ার কৈ ?'

'ঐ তো বিছানা রয়েছে।'

'না।'

'কেন, পরপুরুষের বিছানায় বসলে ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব রাগ করবেন ? তবে আমিই বসি, আমার তো রাগ করবার লোক নেই।'

সতী বিছানার প্রান্তে হাঁটু তুলিয়া বসিল। মমতা দাঁড়াইয়া টিয়া পাখীর মত বিস্কুটের কোণ ঠুকরাইতে লাগিল।

দুখানা বই মাথার বালিসের পাশে পড়িয়া ছিল, সতী একটা বইয়ের পাতা উল্টাইয়া বলিয়া উঠিল—'ও দিদি—সঞ্চয়িতা! দৈত্য কবিতা পড়ে!—এটা কি বই দেখি—ও বাবা, মহাভারতের সারানুবাদ! আমাদের দৈত্য দেখছি ভারি শিক্ষিত দৈত্য।'

মমতা বলিল—'এবার চল, গাড়ীতে ফিরে যেতে হবে। সন্ধ্যে হতে আর বেশী দেরী নেই।'

'আর একটু বসবি না ? দৈত্য হয়তো এখনি ফিরে আসবে।'

'না—চল্।'

সতী অনিচ্ছাভরে উঠিল—'আর একটু থেকে গেলে হত, হয়তো দৈত্য মোটর ইঞ্জিন মেরামত করতে জানে। সেকালে ময়-দানব কত বড় ইঞ্জিনীয়র ছিল জানিস তো।'

মমতা বলিল—'জঙ্গলে টঙ্ বেঁধে থাকে, সে আবার মোটর মেরামত করবে। আয় নীচে যাই।'

মই দিয়া উপরে ওঠা যত সহজ নীচে নামা তত সহজ নয়। দুজনে অতি সন্তর্পণে নামিল। মমতা হাঁফ ছাড়িয়া বলিল—'বাঁচলুম।'

সতী চারিদিকে লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে এমন সময় বাধা পড়িল। জঙ্গলের ভিতর হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া উঠিল—

'কানু কহে রাই—'

আচম্‌কা গানের শব্দে দুই ভগিনী পরস্পর হাত চাপিয়া ধরিল গান দ্রুত কাছে আসিতেছে—

—'কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই।'

সতী রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করিল—'দিদি—?'

মমতা ফ্যাকাসে মুখে বলিল—'মনে হচ্ছে—মৌলিনাথবাবুর গলা—'

এইবার দেখা গেল ঘন গাছপালার চক্র অতিক্রম করিয়া একটি লোক আসিতেছে। তাহার সঙ্গে একটি শ্বেতবর্ণ গাভী। গরুর দড়ি ধরিয়া লোকটি আসিতেছে; পরিধানে হাফ্‌-প্যাণ্ট্‌ ও গরম খাকি শার্ট, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত হোস্‌ ও বুটজুতা। সে মনের আনন্দে তারস্বরে গাহিতেছে—

'আমি রাখালিয়া মতি কি জানি পিরিতি
প্রেমের পসরা তুই।'

হঠাৎ লোকটির গান থামিল, সে দাঁড়াইয়া পড়িল; গরুর দড়ি তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। তারপর সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া মমতা ও সতীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

সতী দেখিল লোকটি সুপুরুষ, মুখের গঠন সুন্দর এবং দৃঢ়, বলিষ্ঠ আয়ত দেহ। মাথার চুলে কদম-ছাঁট, কিন্তু সেজন্য তাহার মুখ শ্রীহীন হয় নাই, বরং করোটির সুন্দর অস্থি-গঠন আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। সতী মনের মধ্যে একটা শিহরণ অনুভব করিল। এই মৌলিনাথ, যাহাকে মমতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

মৌলিনাথ বলিল—'আপনারা—'

সতী এক নিঃশ্বাসে বলিল—'আমরা মোটরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, মোটর খারাপ হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে বসেছিলুম, আপনার ধোঁয়া দেখে এখানে এসেছি। আপনার ঘরে ঢুকেছিলুম—বিস্কুট খেয়েছি। আপনি অ্যাত্তবড় কেট্‌লিতে চায়ের জল চড়িয়েছেন কেন? এত চা খাবেন?'

মৌলিনাথ গম্ভীর মুখে একবার কেট্‌লির দিকে তাকাইল, বলিল—'ওটা চায়ের জল নয়, স্নান করব বলে চড়িয়েছিলুম।'

সতী একটু হাঁ করিয়া বলিল—'ও—আপনি গরম জলে স্নান করেন।'

মৌলিনাথ বলিল—'রোজ গরম জলে স্নান করিনা, কাছেই একটা ঝরণা আছে তাতে স্নান করি। আজ গরম জলে নাইবার ইচ্ছে হয়েছিল তাই জল চড়িয়ে ধবলীকে আনতে গিয়েছিলাম।'

সতী বলিল—'ও—আপনার গরুর নাম ধবলী। কোথায় ছিল?'

'ঝরণার ধারে চরছিল।'

'ও—ওর বাচ্ছা কোথায়?'

'বাছুরটা মারা গেছে।'

'আহা—কি হয়েছিল?'

'হয়নি কিছু। বাঘে নিয়ে গেছে।'

মমতা একটু অধীরভাবে ইহাদের বিশ্রব্ধ বাক্যালাপ শুনিতেছিল, বলিল—'এখানে বাঘ ভালুক আছে নাকি?'

মৌলিনাথ মমতাকে নিশ্চয় চিনিয়াছিল কিন্তু চেনার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করে নাই; এখনও অচেনার মতই বলিল—'বাঘ আছে কিন্তু মানুষখেকো বাঘ নয়; ছোট জাতের চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ, এই সব। ভাল্লুকও আছে কিন্তু তারা নিরামিষাশী।' সে যাক, আপনারা দীনের কুটীরে পদার্পণ করেছেন আমার সৌভাগ্য। আপনাদের জন্যে কি করতে পারি?'

দুই বোন দৃষ্টি বিনিময় করিল। মমতা বলিল—'আপনি মোটর মেরামত করতে জানেন?'

মৌলিনাথ বলিল—'জানি সামান্য। যদি সর্দি কাশির মত মামুলি রোগ হয় তাহলে বোধহয় সারাতে পারব, কিন্তু যদি টাইফয়েড্ কি মেনিঞ্জাইটিস হয় তাহলে আমার বিদ্যেয় কুলোবে না। চলুন দেখি।'

তিনজনে মোটরের উদ্দেশ্যে চলিল। সতীর চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে, অধরের কূলে কূলে উত্তেজিত চাপা হাসি। মমতার মুখের ক্যাকাসে ভাব এখনও কাটে নাই, পাৎলা ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ।

মোটরের কাছে যখন তাহারা পৌঁছিল তখন সূর্যাস্ত হইয়াছে। মৌলিনাথ বনেট খুলিয়া কলকব্জা নাড়াচাড়া করিল, কারবুরেটার দেখিল, স্পার্কিং প্লাগ খুলিল। তারপর বলিল—'কি হয়েছে বুঝতে পেরেছি; কিন্তু আজ রাত্রে মেরামত করা যাবে না। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাবনা।'

এতক্ষণে প্রায় অন্ধকার হইয়া গিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মমতা ও সতী গায়ে কোট পরিয়া লইল।

'তাহলে—'

'আজ রাত্রিটা যদি দীনের কুটীরে কাটাতে রাজি থাকেন, কাল সকালে গাড়ী মেরামত করে দিতে পারি।'

ক্ষণেক নীরবতার পর সতী থামিয়া থামিয়া বলিল—'তাহলে—আজ রাত্তিরটা—দীনের কুটীরেই কাটানো যাক—কি বলিস দিদি ?'

মমতা সিধা উত্তর দিলনা, বলিল—'স্যুটকেশ দুটো এখানে পড়ে থাকবে ?'

মৌলীনাথ বলিল—'না, আমি নিচ্ছি।'

সে পিছনের খোলের ভিতর হইতে স্যুট্‌কেস দুটি বাহির করিয়া দু'হাতে লইল। বিলাতী কম্বল দুটি সতী ও মমতা লইল।

মৌলিনাথ বলিল—'চলুন।'

তিনজনে আবার জঙ্গলে প্রবেশ করিল। মাঝখানে মৌলিনাথ, দু'পাশে দু'জন।

কিছুক্ষণ চলিবার পর মমতা বলিল—'কোন দিকে যাচ্ছি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

মৌলিনাথ বলিল—'আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তো ? আমার ওপর নজর রাখুন, আর কিছু দেখবার দরকার হবে না।'

আরও কিছুক্ষণ অন্ধকারে চলিবার পর মমতা যখন কথা কহিল তখন তাহার কণ্ঠস্বরে যেন একটু তীক্ষ্ণতা ধরা পড়িল—'আমাকে বোধহয় আপনি চিনতে পারেন নি ?'

মৌলিনাথ সহজ স্বরে বলিল—'চিনতে পেরেছি বৈকি ! আপনার কাছে আমি লজ্জিত। আপনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা এখনও পালন করা হয় নি। সাঁওতাল মেয়ে জোগাড় করতে পারিনি।'

বাকি পথটা নীরবে কাটিল। গৃহের পদমূলে পৌঁছিয়া মৌলিনাথ বলিল—'কম্বল দুটো আমায় দিন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যান। এই নিন দেশলাই, ঘরে লণ্ঠন আছে জ্বেলে নেবেন।'

মমতা জিজ্ঞাসা করিল—'শোবার কি ব্যবস্থা হবে?'

মৌলিনাথ বলিল—'ঘরে বিছানা আছে, তাতে আপনাদের দুজনের কুলিয়ে যাবে। আমি নীচে শোব।'

সতী বলিল—'নীচে কোথায় শোবেন?'

'এই পাথরের চাতালের ওপর। গরমের রাত্রে বেশীর ভাগ এইখানেই শুই।'

দুই বোন ওপরে উঠিয়া গেল। সতী লণ্ঠন জ্বালিল। বাহিরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে! দুইজনে বিছানায় বসিয়া ফিকা হাসিল।

'দিদি, ভয় করছে নাকি?'

'একটু একটু।—তোর?'

'উঁহু—হাসি পাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ পরে দ্বারের বাহিরে মৌলিনাথের মুণ্ড দেখা গেল।

'আস্‌তে পারি?'

'আসুন।'

মৌলিনাথ আসিয়া স্যুট্‌কেস দুটি মেঝেয় রাখিল। বলিল—'চা খাবেন নিশ্চয়। আমার সব জোগাড় আছে, কেবল টাট্‌কা দুধ নেই। টিনের দুধ চলবে কি?'

সতী বলিল—'খুব চলবে।'

মৌলিনাথ স্টোভ জ্বালিল। দশ মিনিট পরে ধূমায়িত চায়ের বাটি ও বিস্কুট সামনে রাখিয়া বলিল—'ডিম ভেজে দেব কি? তাজা ডিম আছে, আজ সকালে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এক বন-মুরগীর বাসা থেকে কয়েকটি সংগ্রহ করেছি।'

মমতা সতীর মুখের পানে চাহিল, সতী বলিল—'এখন থাক, রাত্তিরে হবে।'

মৌলিনাথ নিজের চা লইয়া তাহাদের অদূরে মেঝেয় বসিল।

'রাত্তিরের খাওয়ার কথা আমিও ভাবছি। কী রান্না হবে এ সম্বন্ধে মহিলাদের কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আমার ঘরে চাল ডাল তেল ঘি আলু পেঁয়াজ আছে। এখন আপনারা ব্যবস্থা করুন কি রান্না হবে।'

মমতা চায়ের বাটিতে একবার ঠোঁট ঠেকাইয়া বলিল—'রান্না করা আমাদের অভ্যাস নেই মৌলিনাথবাবু।'

মৌলিনাথ কিছুক্ষণ মমতার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর নিজের চায়ে একটি চুমুক দিয়া সহজ সুরে বলিল—'তা বটে। বেশ, আমিই রাঁধব। শুধু ভয় হচ্ছে আমার রান্না আপনারা মুখে দিতে পারবেন না।'

সতী লজ্জিতভাবে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—'আমি মোটামুটি রাঁধতে জানি। বিলেতে যখন দিশি রান্না খাবার ইচ্ছে হত তখন নিজেই রেঁধে খেতুম।'

মৌলিনাথ এবার সতীর পানে ভাল করিয়া চাহিল। প্রথম সাক্ষাতের পর হইতে মৌলিনাথ যখনই কথা বলিয়াছে সিধা মমতাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিয়াছে; অপর পক্ষ হইতে সতী বেশী কথা বলিলেও মৌলিনাথ উত্তর দিয়াছে মমতাকেই। এতক্ষণে সে যেন সতীর স্বতন্ত্র সত্তা টের পাইল। সে কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে সতীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'আপনি রাঁধবেন। তাহলে তো ভালই হয়। অনেক দিন মেয়েদের হাতের রান্না খাইনি। কিন্তু যে উপকরণ আছে তাতে বেশী কিছু রাঁধা চলবে না।'

সতী বলিল—'খিচুড়ি রাঁধা চলবে।'

মৌলিনাথ হৃষ্টমুখে বলিল—'খুব ভাল হবে। শাস্ত্রে লিখেছে—আপৎকালে খিচুড়ি।'

সতী বলিল—'আপনি খিচুড়ি ভালবাসেন তো? অনেকে ভালবাসে না।'

মৌলিনাথ বলিল—'খুব ভালবাসি। এ বিষয়ে আমি সম্রাট সাজাহানের সমকক্ষ।'

সতী হাসিল। মমতার মুখখানা কিন্তু কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া রহিল। ভিতরের বাধা ঠেলিয়া তাহার ব্যবহার স্বাভাবিক হইতে পাইতেছে না।

চা শেষ হইলে মৌলিনাথ উঠিল, বলিল—'আমি এবার নীচে যাই, ধবলীকে বাঁধতে হবে।'

সতী জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় থাকে ধবলী?'

'এই ঘরের নীচে একটা খোঁয়াড় করেছি, রাত্রে সেখানেই বেঁধে রাখি। দিনের বেলা চরে বেড়ায়।'

মৌলিনাথ নামিয়া গেল। মমতা মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া ছিল, পায়ের উপর একটা কম্বল টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। সতী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল,—'দিদি, তুই অমন মনমরা হয়ে আছিস কেন? আমার তো খুব মজা লাগছে।'

মমতা চোখ বুজিয়া বলিল—'বিপদে পড়লে তোর মজা লাগতে পারে, আমার লাগে না।'

সতী বলিল—'বিপদ্ কৈ? বিপদ তো কেটে গেছে। কাল সকালেই বাড়ী যাবি।'

মমতা মুদিতচক্ষে ক্ষণেক নীরব রহিল, তারপর বলিল—'মৌলিনাথবাবুর কাছে অনুগ্রহ নিতে আমার ভাল লাগে না।'

সতী বলিল—'অনুগ্রহ কিসের? বাড়ীতে অতিথি এলে সবাই যত্ন করে। তোর যে ওর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল তা ভুলে যা না। উনি তো ভুলে গেছেন বলেই মনে হচ্ছে।'

মমতা একবার চোখ খুলিয়া সতীর পানে চাহিল, তারপর পাশ ফিরিয়া শুইল।

সতী তখন উঠিয়া ফার্ কোট খুলিয়া ফেলিল, কোমরে আঁচল জড়াইয়া রান্নার আয়োজনে লাগিয়া গেল।

নীচে নামিয়া মৌলিনাথ ধবলীকে খোঁয়াড়ে বন্ধ করিয়া আসিল। প্রস্তর-চত্বরের মাঝখানে আগুন প্রায় নিব-নিব হইয়াছিল, তাহাতে কয়েকটা শুকনা গাছের ডাল ফেলিয়া দিয়া সম্মুখে বসিল, দুই জানু বাহুবেষ্টিত করিয়া শান্ত মুখে বসিয়া রহিল। উপরে লণ্ঠনের আলোতে ঘরের দরজায় একটি চতুষ্কোণ রচিত হইয়াছে, একটি অস্পষ্ট মূর্তি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—মনে হয় যেন মর্ত্যলোক হইতে স্বর্গের একটি আবছায়া দৃশ্য দেখা যাইতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে সতী দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল—'এবার আপনি আসুন। খিচুড়ি তৈরি।'

মৌলিনাথ উপরে উঠিয়া গেল।

লণ্ঠন মাঝখানে রাখিয়া তিনজনে খাইতে বসিল। সতী ও মমতা বিছানার ধারে বসিল, মৌলিনাথ ভাল্লুকের চামড়ার উপর।

বাটিতে করিয়া গরম খিচুড়ি, সঙ্গে আলু-পেঁয়াজের চচ্চড়ি এবং ডিম ভাজা। মৌলিনাথ এক গ্রাস মুখে দিয়াই লাফাইয়া উঠিল—'আরে সর্বনাশ, একি !'

সতী শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—'খেতে ভাল হয়নি ?'

মৌলিনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল—'এ তো খিচুড়ি নয়, এ যে পোলাও।'

সতীর মুখে হাসি ফুটিল। সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'তবু ভাল। আপনি এমন ভয় পাইয়ে দিতে পারেন। দিদি,সত্যি খিচুড়ি ভাল হয়েছে ?'

মমতা বিরক্তি দমনের বিশেষ চেষ্টা না করিয়া বলিল—'হয়েছে রে বাপু হয়েছে। আমার মুখে এখন কিছুরই স্বাদ নেই। কোনও মতে রাতটা কাটাতে পারলে বাঁচি।'

সতী অপ্রতিভ হইল। মৌলিনাথ গম্ভীর চোখে মমতাকে নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'আপনার বিরক্তি স্বাভাবিক। কিন্তু উপায় তো নেই, কথায় বলে দুরবস্থায় পড়লে বাঘ ফড়িং খায়। আমারও এমন দুর্ভাগ্য অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে পারলাম না।'

মমতা বোধহয় নিজের রূঢ়তায় একটু লজ্জিত হইয়াছিল, হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আপনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। আপনি যথাসাধ্য করেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ।'

অতঃপর আহার প্রায় নীরবে সমাপ্ত হইল।

মৌলিনাথ নিজের কম্বলটা হাতের উপর ফেলিল, দেয়াল হইতে রাইফেল নামাইয়া বগলে লইল, কয়েকটা টোটা পকেটে পুরিল; হাসিমুখে বলিল—'এবার আপনারা শুয়ে পড়ুন।'

সতী বলিল—'আপনি রাইফেল নিয়ে যাচ্ছেন, তার মানে—'

মৌলিনাথ বলিল—'দরকার হবে বলে নিয়ে যাচ্ছি তা নয়। ওটা সঙ্গে থাকলে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোনো যায়।'

মৌলিনাথ সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, সতী দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

'বাঘ কি মই বেয়ে উঠতে পারে?'

'না, ওদের ও বিদ্যে নেই। তবু দরজা বন্ধ করে দিন।'

এই সময় সতী নিজের কব্জিতে ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া উঠিল—'একি, এখন যে মোটে সাড়ে সাতটা। আমি ভেবেছিলুম কত রাত্তির হয়ে গেছে।'

মৌলিনাথ বলিল—'জঙ্গলে সাড়ে সাতটাই রাত দুপুর। শুয়ে পড়ুন।'

'এত শিগগির ঘুম আসবে কেন। তার চেয়ে—আপনি বলছিলেন অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে পারেন নি। তাই না হয় করুন না।'

'কী করব? মহিলাদের মনোরঞ্জনের কোনও বিদ্যেই যে জানা নেই।'

'কেন, গান গাইতে তো জানেন।'

'গান!' হঠাৎ মৌলিনাথের কণ্ঠ হইতে স্বতস্ফূর্ত হাসির আওয়াজ উৎসারিত হইয়া উঠিল—'কি গান শুনবেন? কানু কহে রাই?'

'না, অন্য কিছু। গাইবেন?'

মৌলিনাথ উত্তর দিবার পূর্বেই মমতা বলিয়া উঠিল—'সতী, বাড়া-বাড়ি করিস নি। যা রয়-সয় তাই ভাল। দোর বন্ধ করে দে।'

সতী ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল মমতা শুইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল, আলো কমাইয়া মমতার পাশে গিয়া শুইল। কম্বলটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইয়া তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল। বলিল—'যাই বলিস, আমাদের ভাগ্যি ভাল যে এই জঙ্গলের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের দেখা পেয়েছি। ভদ্রলোক না হয়ে ছোটলোকও হতে পারত।'

মমতা গলার মধ্যে কেবল একটা শব্দ করিল।

নীচে মৌলিনাথ প্রস্তর পট্টের উপর শয়ন করিয়াছিল; অর্ধেক কম্বলে বিছানা, বাকি অর্ধেক আবরণ। মাথায় রাইফেলের কুঁদা। সে ঊর্ধ্ব-মুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল; তাহার অধরে বিচিত্র কৌতুকের হাসি খেলা করিতে লাগিল।

তারপর সে গান ধরিল; প্রথমে গুঞ্জরণ, তারপর স্পষ্ট স্বর—

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি

*   *   *   *

কেউ জ্বালে না আর বাতি
তার চির-দুখের রাতে
কেউ দ্বার খুলি জাগে
চায় নব চাঁদের তিথি।

গান শেষ হইল। উপরের ঘর হইতে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মৌলিনাথ পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

ঘরে মমতা ও সতী পাশাপাশি শুইয়া আছে। মমতার চক্ষু মুদিত, হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সতী নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে।

আজ বোধহয় কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া কি চতুর্থী। জঙ্গলের মাথা ছাড়াইয়া চাঁদ উঠিতেছে। নব চাঁদের তিথি।···

চাঁদ যখন মধ্যগগনে তখন মৌলিনাথের ঘুম ভাঙিয়া গেল। কোথায় যেন খুট্ করিয়া শব্দ হইয়াছে। একেবারে রাইফেল হাতে লইয়া সে উঠিয়া বসিল।

বাঘ নয়। মই দিয়া একজন নামিয়া আসিতেছে, ফার্ কোট পরা চেহারা— পিছন দিক হইতে দেখিয়া মৌলিনাথ চিনিতে পারিল না, মমতা না সতী।

সতী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। উর্ধ্বমুখী হইয়া চাঁদের পানে চাহিল, চারিদিকে ঘাড় ফিরাইয়া আলো-ঝিল্‌মিল্ বনানী দেখিল, তারপর পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। বিছানায় বালিসের ঘর্ষণে তাহার খোঁপা খুলিয়া বেণী এলাইয়া পড়িয়াছে।

মৌলিনাথ রাইফেল রাখিয়া বলিল—'আপনি।'

সতী বলিল—'ঘুম হলনা, তাই নেমে এলুম। দিদি ঘুমুচ্ছে।

মৌলিনাথ বলিল—'নতুন জায়গায় সকলের ঘুম আসে না।'

সতী বলিল—'সেজন্যে নয়। এত ভাল লাগছে যে ঘুমুতে পারছি না।'

মৌলিনাথের কণ্ঠস্বরে একটু সকৌতুক বিস্ময় প্রকাশ পাইল—'এত ভাল লাগছে—!'

'বিশ্বাস করছেন না? সত্যি বলছি। যদি সারা জীবন এমনি জঙ্গলে কাটাতে পারতুম বোধ হয় আর কিছু চাইতুম না।'

'এখন তাই মনে হচ্ছে, দু'দিন থাকলে মন তখন পালাই পালাই করবে।'

'আপনার কি মন পালাই পালাই করে?'

'না। এ আমার নিজের জঙ্গল, এর প্রত্যেকটি গাছ আমার চেনা, প্রত্যেকটি পাখার সঙ্গে আলাপ আছে। বাঘ ভাল্লুকেরাও অপরিচিত নয়, কে কোথায় থাকে তার ঠিকানা জানি।'

সতী চুপ করিয়া রহিল। অনেক দূর হইতে ঐক্যতানের শব্দ ভাসিয়া আসিল; শৃগালেরা রাত্রির মধ্যযাম ঘোষণা করিতেছে।

'আপনার কি শহরে যেতে একেবারেই ভাল লাগেনা?'

'মাসে দু'মাসে একবার যাই। যখন ফিরে আসি তখন আরও মিষ্টি লাগে।'

'আপনি মানুষের সঙ্গ ভালবাসেন না?'

মৌলিনাথ স্মিতমুখে নীরব রহিল।

'চুপ করে রইলেন যে! বলুন না।'

'ও কথা যেতে দিন না।'

'না, বলুন।'

মৌলিনাথ আর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—'কি বলব, মনের কথা কি স্পষ্ট করে বলা যায়। মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে মনের মানুষ যারা তাদের সঙ্গ ভাল লাগে, যারা তা নয় তাদের সঙ্গ ভাল লাগেনা। কিন্তু সমানধর্মা মানুষ পৃথিবীতে বেশী নেই। যেখানে যত বেশী মানুষ সেখানে তত বেশী বিরোধ, তত তীব্র স্বার্থপরতা। তার চেয়ে আমার জঙ্গল ভাল।'

সতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল—'জঙ্গলে কি বিরোধ স্বার্থপরতা নেই?'

'আছে। কিন্তু অহেতুক বিরোধ নেই, দলবদ্ধ স্বার্থপরতা নেই। বাঘেরা দল বেঁধে বাঘের সঙ্গে লড়াই করেনা, হরিণেরা সংঘবদ্ধ হয়ে হরিণের সঙ্গে ঝগড়া করেনা। আর আমি তো জঙ্গলের মধ্যে একা, কার সঙ্গে ঝগড়া করব?'

'তাহলে মোট কথা এই যে, মনের মানুষ অর্থাৎ সমানধর্মা মানুষ পেলে আপনি ঝগড়া করবেন না।'

'ঝগড়া আমি কোনও অবস্থাতেই করব না, ঝগড়ার উপক্রম দেখলেই পালিয়ে যাব।'

'আপনি পুরুষ মানুষ, ঝগড়ার নামে পালাবেন? এ যে পলাতক মনোবৃত্তি।'

'হোক পলাতক মনোবৃত্তি। আমি পালাব।'

মৌলিনাথের বলিবার ভঙ্গী শুনিয়া সতী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

'সতী!'

দু'জনে একসঙ্গে উপর দিকে তাকাইল। মমতা দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া। পশ্চিমে ঢলিয়া পড়া চাঁদের আলো তাহার মুখে পড়িয়াছে।

সতী বলিল—'দিদি, তোর ঘুম ভেঙেছে। নীচে আয়না।'

মমতা বলিল—'না, তুই ওপরে চলে আয়। এত রাত্রে ওখানে থাকতে হবেনা।'

'কটা বেজেছে?' সতীর হাতে ঘড়ি নাই, সে ঘড়ি খুলিয়া শয়ন করিয়াছিল।

'তিনটে বেজে গেছে।'

'তবে তো ভোর হয়ে এল। আর ঘুমিয়ে কি হবে!'

'সতী! চলে এস। বড় বাড়াবাড়ি করছ তুমি। আইবুড় মেয়ের অত ভাল নয়।' মমতার স্বর কঠিন।

সতী কিছুক্ষণ হতবাক হইয়া রহিল, তারপর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল মৌলিনাথ নিঃশব্দে হাসিতেছে। সে আর বাঙনিষ্পত্তি করিল না, উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল।

রাত্রির যবনিকা উঠিয়া যাইতেছে; ভোর হইতে আর দেরী নাই। প্রথমে একটি বন-মোরগ তরুশীর্ষ হইতে ডাক দিল; তাহার ক্রোশন থামিতে না থামিতে দূরে আর একটি মোরগ ডাকিল; তারপর আরও দূরে আর একটি ডাকিল। এই শব্দে দোয়েল হাঁড়িচাঁচা টিয়া চড়ুই পায়রা ছাতারে সকলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বন মুখর হইয়া উঠিল।

সূর্যোদয় হইল।

মমতা ও সতী টঙ্ হইতে নামিয়া আসিল। তাহাদের কাঁধে বড় টার্কিশ্ তোয়ালে, হাতে টুথ্-ব্রাশ ও সাবানের কৌটা। মমতার মুখ গম্ভীর, সতীর মুখে গাম্ভীর্য ও হাসি লুকোচুরি খেলিতেছে।

মমতা মৌলিনাথকে বলিল—'ঝরণাটা কোন্ দিকে দেখিয়ে দিন তো।'

মৌলিনাথ তাহাদের ঝরণা পর্যন্ত পৌছাইয়া দিল, ফিরিয়া আসিয়া

চায়ের জল চড়াইল। ধবলী খোঁয়াড়ের মধ্যে হাম্বারব করিতেছিল, তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

ঝর্ণার নির্জনতা হইতে ফিরিবার পথে মমতা কাঁটা-ঝোপের আকর্ষণ বাঁচাইয়া চলিতে চলিতে বলিল—'বাবা, জঙ্গলে মানুষ থাকে? ভাগ্যিস ওকে বিয়ে করিনি।'

সতী বলিল—'ভাগ্যিস।'

তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মৌলিনাথ পাটাতনের উপর চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

ডিমসিদ্ধ ও বিস্কুট সহযোগে চা খাওয়া শেষ হইলে মৌলিনাথ বলিল—'এবার তাহলে মোটর মেরামতের চেষ্টায় যাওয়া যাক। আপনারা কি আমার সঙ্গে আসবেন?'

তাহার বক্তব্য শেষ হইল না, জঙ্গলের মধ্যে বিলাতী ব্লাড-হাউণ্ড্ কুকুরের গভীর ডাক শোনা গেল। তারপর কয়েকজন লোক তরুচক্রের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সর্বাগ্রে আসিতেছেন কুকুরের শিকল ধরিয়া মমতার স্বামী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ভৌমিক; তাঁহার পিছনে উর্দি-পরা কয়েকজন লোক। মিস্টার ভৌমিকের চেহারা ইঞ্জিনের মত, কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া। এবং তাহার অভ্যন্তরে যে লৌহ-গলন শৈল-দলন অচল-চলন মন্ত্র নিহিত আছে তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায়।

মমতা ত্বরিতপদে গিয়া স্বামীর বাহুর সহিত বাহু জড়াইয়া লইল, কুকুরের মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া মিস্টার ভৌমিক স্ত্রীর জবানবন্দী শুনিলেন, নিজের হালও বয়ান করিলেন। কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত স্ত্রী ও শ্যালিকা পৌঁছিল না দেখিয়া

তিনি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তারপর আজ প্রাতঃকালে কুকুর লইয়া খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন।

এদিকে সতী ও মৌলিনাথ একক দাঁড়াইয়া আছে। সতী অনাবশ্যক সংবাদ দিল—'দিদির স্বামী মিস্টার ভৌমিক—ম্যাজিস্ট্রেট।'

উত্তরে মৌলিনাথ শুধু ভ্রূ তুলিল।

মিস্টার ভৌমিক স্ত্রীকে বাহুলগ্ন করিয়া অগ্রসর হইলেন। সতীর সম্মুখে আসিয়া টুপী খুলিয়া বলিলেন—'এই যে সতী। কেমন আছ?'

সতী বলিল—'আপনি কেমন আছেন?'

শ্যালিকাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মৌলিনাথের দিকে ফিরিলেন, কড়া স্বরে বলিলেন—'এই ঘর আপনার?'

মৌলিনাথ বলিল—'হ্যাঁ।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন—'আশা করি এ জমি আপনার, আপনি গভর্ণমেণ্টের খাস মহলে trespass করেন নি।'

মৌলিনাথ বলিল—'এ জঙ্গল আমার, আমি গভর্ণমেণ্টের খাস মহলে trespass করিনি। এবং গভর্ণমেণ্ট যদি আমার জঙ্গলে trespass করে আমি গভর্ণমেণ্টের ঠ্যাং ভেঙে দেব।'

সতী অবাক হইয়া মৌলিনাথের পানে চাহিল; ঝগড়ার নামে যে-লোক পলায়ন করিতে বদ্ধপরিকর কথাগুলা তাহার মত নয়। সতী হঠাৎ সজোরে হাসিয়া উঠিল। ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু হাসিলেন না, রাগও করিলেন না। আপন শক্তিতে তিনি অটল। স্ত্রীকে বলিলেন—'চল, এবার যাওয়া যাক। ভাঙা গাড়ীটা টেনে নিয়ে যেতে হবে। তোমাদের জিনিসপত্র কোথায়?'

মমতা আঙুল দেখাইয়া বলিল—'ঐ ঘরে আছে। দুটো স্যুটকেস।'

ম্যাজিস্ট্রেট আর্দালিকে হুকুম দিলেন স্যুটকেশ দুটা নামাইয়া

আনিতে। আর্দালি উপরে উঠিবার উপক্রম করিলে সতী বলিল—'আমার স্যুট্‌কেশ নামাবার দরকার নেই।'

সকলের সপ্রশ্ন চক্ষু সতীর দিকে ফিরিল। সতী সহজ স্বরে বলিল—'আমি এখন যাব না, এখানেই থাকব।'

সকলের চোখের প্রশ্ন কণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। মমতা আর্ত অবিশ্বাসের সুরে বলিল—'সতী!'

সতী বলিল—'এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। জায়গাটা আমার ভাল লেগেছে তাই থাকব।'

'কিন্তু—একলা থাকবি কি করে?'

'একলা কেন, উনিও তো থাকবেন', বলিয়া সতী চিবুকের সঙ্কেতে মৌলিনাথকে দেখাইল।

মমতা জ্বলিয়া উঠিল—'তুই হলি কি! শিক্ষাদীক্ষা মান মর্যাদা সব জলাঞ্জলি দিলি।—ও সব হবে না, আমার সঙ্গে এসেছিস, আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। মামা-মামীমার কাছে আমার একটা দায়িত্ব আছে।'

'আমি যাব না।'

ম্যাজিস্ট্রেট এতক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চন করিয়া নীরব ছিলেন, মৌলিনাথের দিকে ফিরিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন—'এর মানে কি?'

মৌলিনাথ বলিল—'মানে আমিও জানি না। একটু অপেক্ষা করুন, দেখি যদি বুঝতে পারি।'

হাতের সংকেতে সতীকে ডাকিয়া মৌলিনাথ একটু দূরে লইয়া গেল, গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—'ব্যাপার কি?'

সতীর চোখ ছল ছল করিতেছে, স্ফুরিত অধরে সে বলিল—'আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।'

'কিন্তু—না যাওয়ার মানে বুঝতে পারছ?'

'পারছি। ছেলেমানুষ নই, একুশ বছর বয়স হয়েছে।'

'তার মানে আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?—কেমন?'

সতীর বাঁ চোখ হইতে একফোঁটা জল গড়াইয়া গালের উপর পড়িল। সে উত্তর দিল না।

মৌলিনাথ বলিল—'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।—কিন্তু যতক্ষণ বিয়ে না হচ্চে ততক্ষণ এখানে থাকবে কোথায়?'

'কেন, আমি ঘরে শোব, তুমি নীচে শুয়ো।'

'চমৎকার ব্যবস্থা। আমাকে যদি বাঘে নিয়ে যায়?'

'বেশ, আমি নীচে শোব, তুমি ঘরে শুয়ো।'

'আরও চমৎকার। তোমাকে বাঘে খেতে পারে না?'

'সে আমি জানি না।'

স্ত্রীজাতির ইহাই শেষ যুক্তি। মৌলিনাথ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ঘাড় চুল্‌কাইল, তারপর সতীর হাত ধরিয়া বলিল—'এস দেখি, যদি কিছু ব্যবস্থা হয়।'

দু'জনে পাশাপাশি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ম্যাজিস্টেট ইতিমধ্যে একটা প্রকাণ্ড সিগার ধরাইয়া ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়িতেছিলেন, মৌলিনাথ বলিল—'সতী এখানেই থাকবে। এমন কি সেজন্যে আমাকে বিয়ে করতে পর্যন্ত তৈরি আছে। আমারও অমত নেই।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন—'ড্যাম্।'

মমতা দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—'এমন বেহায়া মেয়ে দেখিনি। ছি ছি!'

মৌলিনাথ বলিল—'ঠিক বলেছেন। কিন্তু উপায় নেই, ও সাবালিকা। মিস্টার ভৌমিক, এক্ষেত্রে আপনিই সব দিক রক্ষে করতে পারেন। সতী আপনার শালী একথাটা স্মরণ রাখবেন।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন—'হোয়া জু' মীন্?'

মৌলিনাথ বলিল—'আপনি ম্যাজিস্ট্রেট, বিয়ে দেবার অধিকার আপনার আছে। সাক্ষি সাবুতও উপস্থিত। আপনি যদি বিয়ে না দিয়ে চলে যান একটা কেলেঙ্কারি হবে। সতী আপনার শালী, সুতরাং দুর্নাম হবে আপনারই বেশী।'

ম্যাজিস্ট্রেট ঘন ঘন ধূম উদগিরণ করিয়া মৌলিনাথ ও সতীকে দৃষ্টিপ্রসাদে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার ইঞ্জিনের মত মুখে অতি সামান্য একটু বাষ্পাচ্ছন্ন হাসির আভাস দেখা দিল। কখন পিছু হটিতে হয় ইঞ্জিন তাহা জানে।

অতঃপর এক ঘণ্টা সময় কাটিয়া গিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সস্ত্রীক সানুচর প্রস্থান করিয়াছেন। মমতা যাইবার সময় সতীর সঙ্গে কথা বলে নাই, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

প্রস্তর-পট্টের কিনারায় সতী ও মৌলিনাথ পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল। দুজনের মুখই চিন্তাগ্রস্ত।

মৌলিনাথ বলিল—'হিন্দুদের আট রকম বিয়ের ব্যবস্থা, তার মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহ আছে, পৈশাচ বিবাহ আছে, রাক্ষস বিবাহ আছে আমাদের বিয়েটা কোন্ বিবাহ বুঝতে পারছি না।'

সতী বলিল—'বোধহয় খোক্কস বিবাহ।'

মৌলিনাথ সতীর কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। বলিল—'কি কাণ্ডটা করলে বল দেখি। এক রাত্তিরে এত হয়?'

সতী বলিল—'যার হবার তার এক রাত্তিরেই হয়।—জামাইবাবু কিন্তু খুব ভাল লোক। দিদিটা ইয়ে। ভাগ্যিস তোমাকে বিয়ে করে নি।'

'ভাগ্যিস। কিন্তু ও কথা যাক। যে কাণ্ড করলে তার ফলাফল চিন্তা করেছ কি?'

'কী ফলাফল ?'

'রোজ নিজের হাতে রাঁধতে হবে।'

'রাঁধতে আমি ভালবাসি।'

'বাসন মাজতে হবে।'

'মাজব।'

'বাথরুম নেই, জলের কল নেই। ঝরণায় গিয়ে নাইতে হবে।'

'নাইব। কেট্‌লীতে জল গরম করেও নাইব।'

'ধবলী চরাতে হবে।'

সতী ঘাড় তুলিয়া বলিল—'আমি ধবলী চরাব কেন? চণ্ডীদাস কী লিখেছেন? ধবলী চরাবে তুমি।'

'আচ্ছা আচ্ছা।'

সতী মুচ্‌কি হাসিল।

'এবার তাহলে গানটা গেয়ে ফেল।'

'কোন্ গান?'

'কানু কহে রাই।'

দু'জনে আরো ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিল। জঙ্গলে পশুপক্ষী ছাড়া সাক্ষী নাই, তাহারাও পরের প্রণয়লীলা গ্রাহ্য করে না। মৌলিনাথ সতীকে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া লইয়া গান ধরিল। একটা কাঠঠোকরা অদৃশ্য থাকিয়া গানের সঙ্গে ঠেকা দিতে লাগিল।

বড় ঘরের কথা

নিম্নোক্ত কাহিনীটি আমি শুনিতে পাইতাম কি না সন্দেহ, যদি না সে-রাত্রে গ্রামের জমিদারবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ থাকিত। আমি গ্রামে নবাগত, কিন্তু জমিদার মহাশয় তাঁহার কন্যার বিবাহে গ্রামসুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, আমিও বাদ পড়ি নাই।

যিনি গল্প বলিলেন তাঁহার নাম ভুবন বিশ্বাস। রোগা চিম্‌সে চেহারার বৃদ্ধ, নস্য লইয়া সজল চকিত চক্ষে এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং অসংলগ্ন দুই-চারিটা কথা বলিয়া চুপ করিয়া যান। পূর্বে তিনি পাশের কোনও এক জমিদারীর সরকার কিম্বা গোমস্তা ছিলেন। কয়েক বছর হইল অবসর লইয়াছেন। আমি গ্রামের বারোয়ারী গ্রন্থাগারের সমাবর্তন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি, দু'একদিন থাকিয়া চলিয়া যাইব। অন্যান্য গ্রামবাসীর মত ভুবনবাবুর সহিতও সামান্য পরিচয় হইয়াছিল।

জমিদার বাড়ীর বিস্তীর্ণ বারান্দায় নিমন্ত্রিতদের জন্য শতরঞ্জি পাতা হইয়াছিল। অতিথিদের মধ্যে একদল অন্দরের উঠানে খাইতে বসিয়াছেন। আমরা দ্বিতীয় ব্যাচ্‌ বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছি। চারিদিকে গ্যাস বাতি ও ডে-লাইট জ্বলিতেছে; লোকজনের ছুটাছুটি হাঁকডাক। মাঝে মাঝে শানাই তান ধরিতেছে। রাত্রি আন্দাজ ন'টা।

আমি এবং ভুবনবাবু বারান্দার এক কোণে বসিয়াছিলাম। এদিকটা একটু নিরিবিলি। ভুবনবাবু দুই একটা অসংলগ্ন কথা বলিতেছিলেন।

এই সময় ফটকের সামনে একটি জুড়ি গাড়ী আসিয়া থামিল। ভুবনবাবু একবার গলা বাড়াইয়া দেখিয়া চট করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কারা এল ?'

ভুবনবাবু ঘাড় ফিরাইলেন না, ঠোঁটের কোণ হইতে তেরছাভাবে বলিলেন—'রামপুকুরের জমিদার আর তার মা।'

গৃহস্বামী ছুটিয়া আসিয়া নবাগতদের অভ্যর্থনা করিলেন। জুড়ি হইতে নামিলেন একটি বিধবা মহিলা এবং সিল্কের পাঞ্জাবী পরা এক যুবক। মহিলাটির বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ, এককালে রূপসী ছিলেন, রাশভারী চেহারা, মুখে আভিজাত্যের দৃঢ়তা পরিস্ফুট। পুত্রটি কিন্তু অন্য প্রকার। চেহারা এমন কিছু কুদর্শন নয় কিন্তু মুখে আভিজাত্যের ছাপ নাই। সাজ-পোষাকের মহার্ঘতা এবং মুখের উন্নাসিক ঔদ্ধত্য দিয়া সংজাত কৌলীন্যের অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা আছে, কিন্তু সে-চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই।

গৃহস্বামী মাননীয় অতিথিদের লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ভুবনবাবু এবার ফিরিয়া বসিলেন, দীর্ঘ এক টিপ্ নস্য লইয়া সজলচক্ষে এদিক ওদিক চাহিলেন, তারপর চাপা তিক্ত স্বরে বলিলেন—'বড় ঘরের বড় কথা।'

এখানেই গল্পের সূত্রপাত। তারপর কয়েক কিস্তিতে ভাঙা ভাঙা ভাবে গল্পটি শুনিয়াছিলাম। ভুবনবাবু কয়েক বছর আগে পর্যন্ত রামপুকুর জমিদার বাড়ীতে সরকার ছিলেন; কি কারণে তাঁহার চাকরি যায় তাহা জানিতে পারি নাই। তবে তিনি ভূতপূর্ব প্রভুগোষ্ঠীর উপর প্রসন্ন ছিলেন না তাহা তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গী হইতে অনুমান করিয়াছিলাম। কাহিনীর সব ঘটনা ভুবনবাবুর প্রত্যক্ষদৃষ্ট নয়, ময়না নাম্নী এক দাসীর কাছে তিনি অনেকখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তার উপর আমি

খানিকটা রঙ চড়াইয়াছি। সুতরাং কাহিনীটি ষোল আনা নির্ভরযোগ্য মনে করিলে অন্যায় হইবে। রবীন্দ্রনাথের মানবীর মত ইহার অর্ধেক কল্পনা।

বর্তমান কালে বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর যে দুরবস্থা হইয়াছে, ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও ততটা হয় নাই। মারাত্মক রকম বদ্‌খেয়ালী না হইলে বেশ সম্ভ্রান্তভাবে চলিয়া যাইত, দোল দুর্গোৎসব বারো মাসে তেরো পার্বণ করিয়াও স্বচ্ছলতার অভাব ঘটিত না। রামপুকুরের জমিদার আদিত্যবাবু ছিলেন শুদ্ধ-সংযত চরিত্রের মানুষ, তাই জমিদারীটি মধ্যমাকৃতি হইলেও তিনি প্রজাদের উপর অযথা উৎপীড়ন না করিয়াও মর্যাদার সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিয়াছিলেন। ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি বিপত্নীক হন এবং একমাত্র কন্যা প্রভাবতীর মুখ চাহিয়া পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ লাভের অজুহাতেও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই।

মাতার মৃত্যুকালে প্রভাবতীর বয়স ছিল নয় বছর। এ বয়সের মেয়েরা সাধারণত বেড়া-বিনুনি বাঁধিয়া খেলাঘরে পুতুল খেলায় মত্ত থাকে; কিন্তু প্রভাবতীর চরিত্র এই বয়সেই ছেলেমানুষী বর্জন করিয়া দৃঢ়ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে লালন করিবার প্রয়োজন হয় নাই, সেই বরঞ্চ পরিবারস্থ সকলকে শাসন তাড়ন করিয়া বশীভূত করিয়াছিল। জমিদার পরিবারের অনিবার্য বিধবা পিসি-মাসিরা তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন, ঝি-চাকর নির্বিচারে তাহার আদেশ পালন করিত।

আদিত্যবাবু সগর্ব স্নেহে ভাবিতেন, আমার একটা মেয়ে সাতটা ছেলের সমান। প্রভাবতীর ছেলেরাই হবে আমার বংশধর।

প্রভাবতীর বয়স যখন বারো বছর তখন আদিত্যবাবু তাহাকে

জমিদারী সংক্রান্ত পরামর্শের আসরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখা গেল এ'দকেও তাহার বুদ্ধির প্রাঞ্জলতা কাহারও অপেক্ষা কম নয়; নায়েব মোক্তার এই একফোঁটা মেয়ের বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। আদিত্যবাবুর মুখ স্নেহগর্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নায়েব মোহিনী-বা‍‍ গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন—'মা আমাদের রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।'

তারপর হইতে যখনই বিষয় সংক্রান্ত সলাপরামর্শের প্রয়োজন হইত, আদিত্যবাবু নায়েবকে বলিতেন—'আমাকে আর কেন? প্রভাকে জিগ্যেস কর গিয়ে।'

নায়েব অন্দরমহলে প্রবেশ করিতেন, ডাক দিয়া বলিতেন—'কোথায় গো মা লক্ষ্মী, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে যে।'

ঠাকুর ঘর হইতে হাসিমুখ বাড়াইয়া প্রভাবতী বলিত—'কাকা! একটু বসতে হবে। ঠাকুরের প্রসাদ না পেয়ে যেতে পাবেন না।—ওরে ময়না, কাকার জন্যে আসন পেতে দে।'

ময়না প্রভাবতীর খাস চাকরানী, বয়স দু'জনের প্রায় সমান। ময়না কার্পেটের আসন পাতিয়া দিত, নায়েব উপবেশন করিতেন। তারপর যথাসময় পূজা শেষ হইলে ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নবীনা প্রভুকন্যার সহিত মন্ত্রণা করিতে বসিতেন।

এইভাবে জমিদার পরিবারের বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক ক্রিয়া ঘড়ির কাঁটার মত চলিতে থাকিত।

প্রভাবতীর ষোল বছর বয়সে আদিত্যবাবু তাহার বিবাহ দিলেন। আগেই বিবাহ দিতেন, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইল। পাত্রের নাম নবগোপাল; গোলগাল সুশ্রী চেহারা। গরীবের ছেলে, তিন কুলে কেহ নাই, লেখাপড়ায় ভাল, বৃত্তি পাইয়া বি এ পাশ

করিয়াছে। আদিত্যবাবু ঘরজামাই করিবেন ; সুতরাং নবগোপাল সব দিক দিয়া সুপাত্র।

মহা ধুমধামের সহিত বিবাহ হইল। নহবৎ বাজিল, ব্যাণ্ড বাজিল ; সাতদিন ধরিয়া যাত্রা পাঁচালি কীর্তন চলিল, দীয়তাং ভুজ্যতাং হইল। না হইবেই বা কেন? জমিদারের একমাত্র কন্যা। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আদিত্যবাবু কোনও সাধই অপূর্ণ রাখিলেন না।

জামাই নবগোপাল শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল। নবগোপালের চেহারাটি যেমন মোলায়েম, স্বভাবও তেমনি মৃদু স্নিগ্ধ, মুখের কথা মুখে মিলাইয়া যায়। আদিত্যবাবু বাড়ীর দ্বিতলের একটা মহল মেয়ে জামাইয়ের জন্য আলাদা করিয়া দিলেন। নিভৃত নিরঙ্কুশ পরিবেশের মধ্যে প্রভাবতী ও নবগোপালের দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইল।

দাম্পত্য জীবনের প্রভাত। শীত রাত্রির অবসানে নবারুণপ্রফুল্ল শিশির-বিচ্ছুরিত প্রভাত। কিন্তু কখনও দেখা যায় শীতের রৌদ্র-ঝলমল প্রভাতে সূক্ষ্ম কুহেলিকা আসিয়া আকাশ ঝাপ্সা করিয়া দিয়াছে, সূর্যের প্রসন্নতা অশ্রুবাষ্পের অন্তরালে বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহের পর একমাস কাটিয়া গেল ; ধীরে ধীরে আদিত্যবাবু এবং পরিবারস্থ সকলেই যেন অনুভব করিলেন, যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তেমনটি হয় নাই। কোথায় যেন খুঁত রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু কী খুঁত, কোথায় খুঁত? আদিত্যবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, অথচ কাহাকেও প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। গৃহিণী বাঁচিয়া থাকিলে প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইত না, কিন্তু মাতৃহীনা কন্যার মনের কথা জানা যায় কি করিয়া? প্রভাবতীর মুখ দেখিয়া কিছু অনুমান করা যায় না। সে আগের মতই সাংসারিক ও বৈষয়িক কাজকর্ম পরিদর্শন করে ; পূজার ঘরের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন নিজের হাতে করে ; বৃহৎ

পরিবারের কোথায় কি ঘটিতেছে কিছুই তাহার চক্ষু এড়ায় না। তবু, আদিত্যবাবু যাহা দেখিতে পান না, পরিবারের অন্য কাহারও কাহারও চোখে তাহা চকিতের জন্য ধরা পড়িয়া যায়। প্রভাবতীর মনের চারিধারে যেন সূক্ষ্ম কুয়াশার জাল পড়িয়া গিয়াছে, যাহা পূর্বে অতিশয় স্পষ্ট ও নিঃসংশয় ছিল তাহা আবছায়া হইয়া গিয়াছে; সূর্যের চোখে চাল্‌শে পড়িয়াছে।

ওদিকে জামাই নবগোপালের জীবনের বাহ্য অংশ বেশ বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে সকাল বেলা দারোয়ানের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হয়, ফিরিয়া আসিয়া দপ্তরে শ্বশুরের কাছে বসে; বেলা হইলে নিজের মহলে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বৈকালে আবার বেড়াইতে বাহির হয়, ফিরিয়া শ্বশুরের কাছে বসে। শ্বশুর বুঝিতে পারেন ছেলেটি অতি শান্ত ও সুশীল। তাহার বুদ্ধির ধার হয়তো খুব বেশী নাই কিন্তু ধীরতা আছে। জামাইয়ের আভ্যন্তরিক জীবনের চিত্র কিন্তু আদিত্যবাবু কল্পনা করিতে পারেন না। নিজের মেয়েকে তিনি চেনেন, জামাইকেও অল্প-বিস্তর চিনিয়াছেন, কিন্তু তবু মেয়ে-জামাইয়ের সম্মিলিত জীবন সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছেন না।

অনির্দিষ্ট উদ্বেগের মধ্যে ছয় মাস কাটিয়া গেল। তারপর একদিন আদিত্যবাবু নিভৃতে ময়নাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ময়না প্রভাবতীর দাসী ও নিত্য সহচরী। সে বালবিধবা, কিন্তু জীবনের ভিত্তিস্থানীয় গোপন সত্যগুলি তাহার অপরিচিত নয়।

আদিত্যবাবু ময়নাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, ময়নাও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উত্তর দিল। কিছুই পরিষ্কার হইল না, বরং আদিত্যবাবুর সংশয় আরও বাড়িয়া গেল।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ লইয়া নায়েব-মোক্তারের সহিত আলোচনা করা চলে

না। আদিত্যবাবু মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল ডাক্তার সুরেন দাসের কথা। কলিকাতার বড় ডাক্তার, আদিত্যবাবুর বাল্যবন্ধু। যেমন হৃদয়বান তেমনি ঠোঁটকাটা। আদিত্যবাবু কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় গেলেন।

পরদিন রামপুকুরে নায়েবের কাছে টেলিগ্রাম আসিল—প্রভাবতী ও নবগোপালকে পাঠাইয়া দাও। প্রভাবতী ও নবগোপাল কলিকাতায় গেল।

ডাক্তার সুরেন দাস কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলেন। তারপর আদিত্যবাবুকে আড়ালে বলিলেন—'মেয়ের আবার বিয়ে দাও। এ বিয়ে বিয়েই নয়।'

পক্ষাঘাতগ্রস্ত মন লইয়া আদিত্যবাবু গৃহে ফিরিলেন। প্রভাবতী এবং নবগোপালও ফিরিল। প্রভাবতীর মনের কুয়াশা আর নাই, খর সূর্যালোক সমস্ত অস্পষ্টতা দূর করিয়া দিয়াছে।

দুই দিন আদিত্যবাবু কাহারও সহিত কথা বলিলেন না। কন্যার আবার বিবাহ দেওয়া দূরের কথা, মাতৃজারবৎ একথা কাহাকেও বলিবার নয়। মান সম্ভ্রম বংশ গৌরব সব ধূলিসাৎ হইয়াছে, মেয়েকে ঘিরিয়া যে নন্দনকানন রচনা করিয়াছিলেন তাহা ভস্মীভূত হইয়াছে। সব থাকিতে তাঁহার কিছু নাই, তিনি সর্বস্বান্ত হইয়াছেন।

তৃতীয় দিন সকালবেলা আদিত্যবাবু চুপি চুপি প্রভাবতীর মহলে গেলেন। প্রভাবতী এই সময় পূজার ঘরে থাকে।

প্রভাবতীর মহলে চার পাঁচটি ঘর, তার মধ্যে দুটি শয়নকক্ষ, একটি বসিবার ঘর। নবগোপাল চেয়ারে বসিয়া মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিল, শ্বশুরকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আদিত্যবাবু জামাইয়ের মুখের পানে তাকাইতে পারিলেন না,

লজ্জায় তাঁহার দৃষ্টি মাটি ছাড়িয়া উঠিল না। তিনি অবরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'তুমি এমন কাজ কেন করলে?'

নবগোপাল উত্তর দিল না, নতমুখে দাঁড়াইল রহিল।

'এমন করে আমার সর্বনাশ করলে!'

এবারও নবগোপাল নিরুত্তর রহিল। পাশের ঘরে ময়না আসবাব ঝাড়ামোছা করিতেছিল, সে একবার দ্বার দিয়া উঁকি মারিল, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া গেল।

আদিত্যবাবুও আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া চলিলেন। কিছু বলিয়া লাভ কি? তিনি নিয়তির জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন, গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিলেও মুক্তি নাই। শত বৎসর পূর্বে তাঁহার প্রপিতামহের আমলে এরূপ ব্যাপার ঘটিলে তিনি হয়তো জামাইকে কাটিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিতেন। কিন্তু তাহাতেই বা কি লাভ হইত? কন্যার সুখ সৌভাগ্য বাড়িত না; বংশের মুখ উজ্জ্বল হইত না।

শ্বশুর প্রস্থান করিবার পর নবগোপাল আবার উপবেশন করিল; ঘরের চারিদিকে একবার মন্থর দৃষ্টি ফিরাইল, তারপর মাসিক পত্রিকা তুলিয়া লইল।

দিন কাটিতে লাগিল, দিনের পর দিন। প্রভাবতীকে দেখিয়া অনুমান করা যায় না তাহার মনের মধ্যে কী হইতেছে। তাহার শান্ত সহাস্য দৃঢ়তার অন্তরালে হয়তো ব্যর্থ অভীপ্সার আগুন চাপা আছে, কিন্তু বাহিরে কেহ তাহা দেখিতে পায় না।

তারপর হঠাৎ একদিন আদিত্যবাবু মারা গেলেন। যেন অদৃষ্টের দুর্নিবার আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার শরীর ভিতরে ভিতরে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, বাঁচিবার স্পৃহাও ছিল

না। বুকে ঠাণ্ডা লাগাইয়া কয়েক দিনের জ্বরে তিনি ইহসংসার ত্যাগ করিলেন।

প্রভাবতী জমিদারীর সর্বেসর্বা অধিকারিণী হইল। কিন্তু এই সৌভাগ্যের জন্য সে লালায়িত ছিলনা। পিতার মৃত্যুর পর সে চারদিন শয্যা ছাড়িয়া উঠিল না। পরে স্নান করিয়া সংযত-ভাবে পিতার চতুর্থী ক্রিয়া সম্পন্ন করিল।

জমিদার-সংসার পূর্বের মতই চলিতে লাগিল। গৃহে আদিত্যবাবুর স্থান শূন্য হইল বটে, কিন্তু সেজন্য কাজের কোনও ব্যাঘাত হইল না। নবগোপাল শ্বশুরের স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিল না, যেমন নির্লিপ্ত ছিল তেমনি রহিল। নায়েব প্রভাবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন।

তারপর যত দিন যাইতে লাগিল প্রভাবতীর স্বভাব তত পরিবর্তিত হইতে লাগিল। হঠাৎ কোনও পরিবর্তন ঘটিল না, ধীরে অলক্ষিতে ঘটিল। আগে তাহার চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল, কর্কশতা ছিল না; কথায় শাসন ছিল, তাড়না ছিল না; দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য ছিল, ছিদ্রান্বেষিতা ছিল না। এখন ক্রমে ক্রমে তাহার স্বভাব তীক্ষ্ণ কণ্টকসমাকুল হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে শুচিবাই দেখা দিল। পরিচরবর্গ তাহাকে সম্ভ্রম করিত, এখন ভয় করিয়া চলিতে লাগিল।

তাহার দেহও অদৃশ্য রিপুর আক্রমণ হইতে অক্ষত রহিল না। বিবাহের সময় তাহার রূপ ছিল সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের মত, লাবণ্যের শিশিরে সারা অঙ্গ ঝলমল করিত। ক্রমে শিশির শুকাইয়া আসিল। সেই সঙ্গে একটা স্নায়বিক রোগ দেখা দিল, হঠাৎ কাজ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িত। আবার জ্ঞান হইলে যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে কাজে মন দিত। কেহ ডাক্তার ডাকার প্রস্তাব করিলে অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিত।

আদিত্যবাবুর মৃত্যুর পর দুই বছর কাটিয়া গেল। তপঃকৃশ দেহমন লইয়া প্রভাবতী উনিশ বছরে পদার্পণ করিল।

নবগোপালের জ্বর হইতেছিল। ম্যালেরিয়া জ্বর, আসিবার সময় শীত করিয়া হাত-পা কামড়াইত। স্থানীয় ডাক্তার কুইনিন দিতেছিলেন।

বিকাল বেলা নবগোপালের সাগু তৈরি হইল কি না দেখিবার জন্য প্রভাবতী রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল, ময়না আসিয়া খাটো গলায় বলিল, 'দিদিমণি জামাইবাবুর বোধহয় আবার জ্বর আসছে!'

প্রভাবতী থমকিয়া দাঁড়াইল—'কি করে জানলি?'

ময়না সঙ্কুচিত স্বরে বলিল—'আমি ঘরে গিছলাম, দেখলাম শুয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, বড্ড হাত-পা কামড়াচ্ছে, একটু টিপে দিলে আরাম হয়।'

প্রভাবতী কিছুক্ষণ ময়নার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—'তা টিপে দিলি না কেন?'

ময়না লজ্জিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, প্রভাবতী তখন বলিল—'আচ্ছা তুই সাবু নিয়ে আয়, আমি দেখছি।'

নবগোপাল নিজ শয়নকক্ষে একটা বিলাতী কম্বল গায়ে দিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া ছিল, প্রভাবতী খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। নবগোপাল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আজ আবার জ্বর আসছে।'

প্রভাবতী নরম সুরে বলিল—'হাত-পা কামড়াচ্ছে? আমি টিপে দেব?'

নবগোপাল ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া উঠিল—'না, না, তুমি কেন? সদর থেকে একটা চাকরকে ডেকে পাঠালেই তো হয়।'

'তার দরকার নেই। আমি দিচ্ছি।'

প্রভাবতী খাটে উঠিয়া বসিয়া নবগোপালের গা-হাত টিপিয়া দিতে লাগিল। নবগোপাল আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর প্রভাবতী বলিল—'ডাক্তারটা হয়েছে হতচ্ছাড়া। কম্বুলে ডাক্তার আর কত ভাল হবে। এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি তাকে। জ্বর সারাতে হয় সারাক নইলে বিদেয় হোক।'

ইতিমধ্যে নবগোপালের কাঁপুনি বাড়িয়াছিল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—'এখন ডাক্তার ডেকে কী হবে? জ্বরটা ছাড়ুক—' বলিয়া মাথার উপর কম্বল চাপা দিল।

প্রভাবতী উঠিয়া গিয়া নিজের ঘর হইতে আর একটা কম্বল আনিয়া নবগোপালের গায়ে চাপা দিল। বলিল—'আসুক ডাক্তার, নিজের চোখে দেখুক। ম্যালেরিয়া সারাতে পারে না!' এই সময় ময়না সাগুর বাটি লইয়া প্রবেশ করিলে প্রভাবতী বলিল—'ময়না সাগু রাখ। সদরে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনতে বল। ডাক্তার এসে বসে থাকুক, জ্বর ছাড়লে ওষুধ দিয়ে তবে যাবে।'

অতঃপর ধমক খাইয়া ডাক্তার এমন ঔষধ দিল যে আর জ্বর আসিল না। নবগোপাল ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। গ্রাম্য ডাক্তার সাধারণত একটু হাতে রাখিয়া চিকিৎসা করে; এক দিনে জ্বর ছাড়িয়া গেলে জ্বরের লঘুতাই প্রমাণ হয়, ডাক্তারের কেরামতি প্রমাণ হয় না।

ইহার কয়েকদিন পরে সকাল বেলা প্রভাবতী নায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইল। নায়েব আসিয়া দেখিলেন প্রভাবতী নিজের শয়নঘরে মেঝেয় বসিয়া পান সাজিতেছে। প্রভাবতী নিজে বেশী পান খায় না, কিন্তু নবগোপাল পান দোক্তা খায়; ইহা তাহার একমাত্র ব্যসন। প্রভাবতী নিজের হাতে স্বামীর পান সাজে।

নায়েব প্রভাবতীর সম্মুখে আসনে বসিলেন। প্রভাবতী তাঁহার পানে

চোখ না তুলিয়া বলিল—'কাকা, ওঁর জন্যে একজন খাস-বেয়ারা রাখব ভাবছি। আপনি কি বলেন ?'

নায়েব কিছুক্ষণ প্রভাবতীর নতনেত্র মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। এ বংশের সাবেক প্রথা, অন্দরের সকল কাজ, এমন কি পুরুষদের পরিচর্যা পর্যন্ত, ঝি-চাকরানী করিবে। আদিত্যবাবুরও খাস বেয়ারা ছিল না। নায়েব কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া বলিলেন—'বেশ তো মা, তুমি যখন দরকার মনে করছ তখন রাখলেই হল। এ বংশে অবশ্য—'

'সে আমি জানি। কিন্তু দরকার হলে নিয়ম বদলাতে হয়।'

'তা তো বটেই। আমি লোক দেখছি।' একটু থামিয়া বলিলেন —'একটা লোক ক'দিন থেকে চাকরির জন্যে ঘোরাঘুরি করছে—'

প্রভাবতী মুখ তুলিল—'কি রকম লোক ?'

নায়েব বলিলেন—'দেখে তো ভালই মনে হয়। ভদ্দর চেহারা, চালচলন ভাল, বলছিল কলকাতায় কোন্ ব্যারিস্টারের বাড়ীতে বেয়ারার কাজ করেছে।'

'তবে বোধহয় পারবে।'

'আপাতত ওকেই রেখে দেখা যাক। যদি না পারে তখন অন্য লোক দেখলেই হবে।' নায়েব উঠিলেন—'লোকটা এই সময় আসে। আজ থেকেই বাহাল করে নিই, কি বল ?'

প্রভাবতী বলিল—'তাকে একবার অন্দরে পাঠিয়ে দেবেন। আমি আগে একবার দেখতে চাই।'

'বেশ।' নায়েব চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ময়না ছুটিতে ছুটিতে ঘরে প্রবেশ করিল। 'দিদিমণি—' বলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া পিছন দিকে ইশারা করিল। তাহার চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা।

প্রভাবতী অপ্রসন্ন চোখ তুলিয়া দেখিল দ্বারের কাছে উমেদার ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, ছিটের কামিজ পরা ছিমছাম চেহারা। মুখে চোখে বুদ্ধির সংযম। সে নত হইয়া জোড় হাত কপালে ঠেকাইল।

প্রভাবতী তাহাকে এক নজর দেখিয়া পানের খিলি মুড়িতে মুড়িতে ধীর স্বরে বলিল—'তোমার নাম কি ?'

'আজ্ঞে মোহন।'

'কি কাজ করতে হবে শুনেছ ?'

'আজ্ঞে নায়েববাবু বলেছেন।'

'পারবে ?'

'আজ্ঞে পারব।'

'বাবুকে তেল মাখানো, দরকার হলে হাত-পা টিপে দেওয়া, এসব করতে হবে।'

'আজ্ঞে করব।'

প্রভাবতী তখন ময়নাকে বলিল—'ময়না, ওকে কোণের ঘরটা দেখিয়ে দে, ঐ ঘরে ও থাকবে। আর বাবুর কাছে নিয়ে যা।'

মহলের এক কোণে লম্বা বারান্দার অন্য প্রান্তে একটি ঘর অব্যবহৃত পড়িয়া ছিল, ময়না মোহনকে সঙ্গে লইয়া ঘর দেখাইয়া দিল, তারপর নবগোপালের ঘরে লইয়া গেল।

খাস বেয়ারা দেখিয়া নবগোপাল হাঁ-না কিছুই বলিল না। খুশি হইল কিনা তাহাও বোঝা গেলনা। কয়েক মিনিট পরে ময়না মোহনকে নবগোপালের ঘরে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলে প্রভাবতী বলিল—'ময়না, বাকি পানগুলো সেজে ডাবায় ভরে রাখ, আমার স্নানের সময় হল।'

প্রভাবতীর শয়নকক্ষের লাগাও স্নানের ঘর, সে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। ময়না পান সাজিতে বসিল।

আজ ময়নার মন চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গুলিও অত্যন্ত সজাগ। পান সাজা শেষ করিয়া সে বাটা ভরিয়া নবগোপালের ঘরে রাখিয়া আসিল। দেখিল নূতন চাকর নবগোপালের মাথায় তেল মাখাইয়া দিতেছে।

প্রভাবতীর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে ঘরের এটা ওটা নাড়িয়া, চাড়িয়া আঁচল দিয়া আয়নাটা মুছিবার ছুতায় নিজের মুখ দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সারাদেহে যেন ছট্‌ফটানি ধরিয়াছে। তারপর সে অনুভব করিল, স্নানেরঘর হইতে কোনও সাড়া শব্দ আসিতেছে না।

কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিত চক্ষে স্নানঘরের দ্বারের পানে চাহিয়া থাকিয়া ময়না সন্তর্পণে গিয়া দ্বার ঠেলিল। দেখিল প্রভাবতী অজ্ঞান হইয়া ভিজা মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাহার কাপড় চোপড়ের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় স্নান আরম্ভ করিবার পূর্বেই সে মূর্ছা গিয়াছে।

ময়না চেঁচামেচি করিল না, প্রভাবতীর পাশে ঝুঁকিয়া তাহার মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে প্রভাবতীর জ্ঞান হইল। সে উঠিয়া বসিয়া বস্ত্রাদি সম্বরণ করিতে করিতে বলিল—'হয়েছে, তুই এবার নিজের কাজে যা। কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই।'

নূতন ভৃত্য মোহন যে অতিশয় কর্ম-নিপুণ লোক এবং সব দিক দিয়া বাঞ্ছনীয় তাহা প্রমাণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। সে অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলে ভদ্রলোক বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু সে যত্নপূর্বক নিজেকে ভৃত্য পর্যায়ে আবদ্ধ করিয়া রাখে; খাটো করিয়া কাপড় পরে, মাথায় টেরি কাটে না। তাহার সবচেয়ে বড় গুণ সে অযথা কথা বলে না, মুখে প্রফুল্ল গাম্ভীর্য লইয়া আপন মনে কাজ করিয়া যায়। ময়না যখন

পায়ে পড়িয়া তাহার সহিত কথা বলিতে যায়, সে সংক্ষেপে উত্তর দেয়, মাথামাখির চেষ্টা করে না।

ময়নাকে লইয়াই গোলযোগ বাধিল।

ময়না মেয়েটা এমন কিছু ন্যাকা-বোকা নয়, তাহার পালিশ করা কালো শরীরে বেশ খানিকটা স্বচ্ছ সহজ বুদ্ধি ছিল। কিন্তু মোহন আসার পর হইতে তাহার বুদ্ধি-সুদ্ধি যেন জোয়ারের জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। বিশেষত অবস্থাগতিকে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল, ইচ্ছা থাকিলেও সান্নিধ্য বর্জন করিবার উপায় ছিল না।

সকল দিকেই প্রভাবতীর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, ময়নার রসবিহ্বলতা তাহার চক্ষু এড়ায় নাই। একদিন সে ধমক দিয়া বলিল—'হয়েছে কি তোর? অমন ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন? কাজকর্ম কিছু নেই?'

ময়না ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি প্রভাবতীর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

এইভাবে, মোহন নিযুক্ত হইবার পর মাসখানেক কাটিল। গ্রীষ্মকাল আসিল। আকাশে যেমন অলক্ষিতে বাষ্প সঞ্চিত হইয়া কালবৈশাখীর ভূমিকা রচনা করে, তেমনি জমিদার পরিবারের শত কর্ম-বহুলতার অন্তরালে ধীরে ধীরে উষ্ণতার স্বচ্ছ মেঘ সঞ্চিত হইতে লাগিল।

বৈশাখ মাসের শেষের দিকে এক সকালে প্রভাবতী দ্বিতলের জানালায় দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। রাত্রে গরমে ভাল ঘুম হয় নাই, উত্তপ্ত মুখের উপর সকাল বেলার স্নিগ্ধ বাতাস মন্দ লাগিতেছিল না। কিন্তু এই স্নিগ্ধতা ক্রমে দ্বিপ্রহরের খর প্রদাহে পরিণত হইবে, এই শঙ্কা তাহার মনের সঙ্গে জড়াইয়া জড়াইয়া তাহার জীবনটাকেই দুর্বহ করিয়া তুলিতেছিল; মনে প্রশ্ন জাগিতেছিল, আরম্ভে এতটুকু সরসতা দিয়া ভগবান মানুষকে সারা জীবনের জন্য দুস্তর মরুভূমির শুষ্কতার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছেন কেন?

—'মা, কালীপুরের ভবনাথ চৌধুরী মশায় তাঁর ছোট ছেলেকে নেমন্তন্ন করতে পাঠিয়েছেন !'

প্রভাবতী দিবাস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, দেখিল নায়েব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

'কিসের নেমন্তন্ন ?'

নায়েব বলিলেন—'চৌধুরী মশায়ের প্রথম নাতির অন্নপ্রাশন, খুব ঘটা করেছেন। বলে পাঠিয়েছেন, তোমাকে যেতেই হবে।'

প্রভাবতীর মুখখানা শাদা হইয়া গেল। চৌধুরী মশায় পাশের গ্রামের জমিদার, আদিত্যবাবুর সহিত বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। দেড় বছর আগে তিনি বড় ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন ; এখন নাতির অন্নপ্রাশন।

প্রভাবতী রুদ্ধস্বরে বলিল—'আমি যেতে পারব না কাকা।'

নায়েব বলিলেন—'কিন্তু সেটা কি উচিত হবে মা। আগ্রহ করে নিজের ছেলেকে নেমন্তন্ন করতে পাঠিয়েছেন—যদি না যাও ক্ষুণ্ণ হবেন। লোক-লৌকিকতাও রাখা দরকার।'

প্রভাবতী জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, বলিল—'বলে দেবেন আমার শরীর খারাপ, যেতে পারব না। আর, ছেলের জন্যে রূপোর ঝিনুক-বাটি পাঠাতে হবে তার ব্যবস্থা করুন।'

নায়েব মহাশয় কিছুক্ষণ ক্ষুব্ধ মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন।

জানালার বাহিরে বাতাস ক্রমে উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। প্রভাবতীর দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া উঠিল। সে আঁচলে চোখ মুছিয়া পালঙ্কে আসিয়া বসিল। ধরা-ধরা গলা পরিষ্কার করিয়া ডাকিল—'ময়না !'

ময়নার সাড়া না পাইয়া প্রভাবতী বিরক্ত বিস্ফারিত চক্ষে দ্বারের পানে চাহিল। ময়না সর্বদা কাছে কাছে থাকে, একবারের বেশী দুবার তাহাকে ডাকিতে হয় না। প্রভাবতী উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিল।

লম্বা বারান্দার অপর প্রান্তে মোহনের ঘর। ময়না দ্বারের চৌকাঠে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতরে চাহিয়া আছে।

প্রভাবতী নিঃশব্দ পদে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু ময়না জানিতে পারিল না। মোহন ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতিয়া নবগোপালের একখানা শান্তিপুরী ধুতি চুনট করিতেছে, ময়না তন্ময় সম্মোহিত হইয়া তাহাই দেখিতেছে।

এতক্ষণ প্রভাবতীর মনে যে অবরুদ্ধ বাষ্প তাল পাকাইতেছিল এই ছিদ্রপথে তাহা বাহির হইয়া আসিল। সে তীব্রস্বরে বলিল—'ময়না! কি হচ্ছে তোমার এখানে? ডাকলে শুনতে পাও না!'

ময়না চমকিয়া প্রভাবতীকে দেখিয়া যেন কেঁচো হইয়া গেল— 'দিদিমণি, তুমি ডেকেছিলে? আমি—আমি শুনতে পাইনি।'

দাঁতে দাঁত চাপিয়া প্রভাবতী বলিল—'শুনতে পাওনি। এসো এদিকে একবার, ভাল করে শোনাচ্ছি।'

সে ফিরিয়া চলিল, ময়না শঙ্কিত শীর্ণ মুখে তার পিছনে চলিল। মোহন প্রভাবতীর স্বর শুনিয়া চকিতে মুখ তুলিয়াছিল, আবার ঘাড় হেঁট করিয়া কাজে মন দিল।

ময়নাকে লইয়া প্রভাবতী নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিল. প্রজ্বলিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'ভেবেছিস কি তুই? সাপের পাঁচ-পা দেখেছিস?'

ময়না ক্রন্দনোন্মুখ ভয়ার্ত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভাবতী বলিল

—'ভেবেছিস আমার চোখ নেই, কিছু দেখতে পাই না! মোহনের সঙ্গে তোর কী? খুলে বল্ হতভাগী, নইলে ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝাড়ব।'

ময়না প্রভাবতীর পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'আমি কোনও পাপ করিনি, দিদিমণি, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।'

প্রভাবতী পা সরাইয়া লইয়া বলিল—'হয়েছে, আর ন্যাকামি করতে হবে না। আমি সব বুঝি। তোকেও ঝ্যাঁটা মেরে বিদেয় করব, ওকেও বিদেয় করব। আমার বাড়ীতে ওসব চলবে না।'

'আমার কোনও দোষ নেই দিদিমণি!'

'তোর দোষ নেই! সব দোষ তোর। তুই না বিধবা! তোর মাথা মুড়িয়ে গাঁ থেকে দূর করে দেব। নষ্টামির আর যায়গা পাস্‌নি।'

ভয়ে দিশাহারা হইয়া ময়না প্রভাবতীর পায়ে মাথা কুটিতে লাগিল—'আমার দোষ নেই—আমার দোষ নেই—মা কালীর দিব্যি—বাবা তারকনাথের দিব্যি। আমি কিছু করিনি—ওই আমাকে ডেকেছে—'

'কি বললি—তোকে ডেকেছে?'

'হ্যাঁ, আজ রাত্তিরে ওর ঘরে যেতে বলেছে।'

প্রভাবতী ক্ষণেকের জন্য হতবাক্ হইয়া গেল, তারপর গর্জিয়া উঠিল—'তাই বুঝি সকাল থেকে ওর দোরে ধর্না দিয়েছিস! হারামজাদি, তোকে আঁশ বঁটিতে কুটব আমি, কুটে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।'

ময়না মাথা কুটিতে কুটিতে বলিল—'তাই কর দিদিমণি, তাই কর, আমার সব জ্বালা জুড়োক।'

প্রভাবতী কিছুক্ষণ অঙ্গারচক্ষু মেলিয়া ময়নার পানে চাহিয়া রহিল,

তারপর তাহার নড়া ধরিয়া তুলিয়া স্নানঘরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল—'আজ সারাদিন সারারাত ঘরে বন্ধ থাকবি তুই, খেতে পাবি না। আর মোহনের ব্যবস্থাও আমি করছি।' ময়নাকে সে স্নানঘরে ঠেলিয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিল।

নিজের শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিয়া সে কয়েক মিনিট গুম হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণের জন্য তাহার সংজ্ঞা রহিল না।

জ্ঞান হইবার পরও প্রভাবতী শয্যায় পড়িয়া রহিল, উঠিল না। দ্বিপ্রহরে খাইবার ডাক আসিলে সে বলিয়া পাঠাইল—'আমার শরীর খারাপ, কিছু খাব না। ময়নাও খাবে না।'

নবগোপাল আহারাদি সম্পন্ন করিয়া প্রভাবতীর খাটের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, শান্তকণ্ঠে বলিল—'শরীর খারাপ হয়েছে? ডাক্তারকে খবর পাঠাব?'

'দরকার নেই' বলিয়া প্রভাবতী পাশ ফিরিয়া শুইল।

নবগোপাল আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া লঘুপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহর ক্রমে পশ্চিমে গড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ অসহ্য গরম কাটিয়া শন্ শন্ বাতাস বহিল, আকাশের কোণ হইতে রাশি রাশি কালো মেঘ ছুটিয়া আসিয়া আকাশ দখল করিয়া বসিল। ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

প্রভাবতী উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিল। প্রবল বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ছাট তাহার মুখ ভিজাইয়া দিল, বুকের কাপড় ভিজাইয়া দিল। সে ঊর্ধ্বে মেঘের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমে দিন শেষ হইয়া রাত্রি আসিল, ঝড়-বৃষ্টি থামিল। আকাশে

বাতাসে স্নিগ্ধ শীতলতা, ধরণীর বুকে তৃষ্ণা নিবৃত্তির পরিপূর্ণ তৃপ্তি। প্রভাবতী আবার শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। শুষ্ক দহমান অন্তর লইয়া পড়িয়া রহিল। সৃষ্টির মধ্যে সেই যেন শুধু সৃষ্টিছাড়া।

দাসী ঘরে আলো দিতে আসিল। প্রভাবতী একবার চোখ খুলিয়া আবার চোখ বুজিল, বলিল—'আলো দরকার নেই, নিয়ে যা।'

দ্বিপ্রহর রাত্রি। বাড়ীতে কোথাও আলো নাই, শব্দ নাই। নিশীথিনী যেন সর্বাঙ্গে শীতলতার চন্দন-প্রলেপ মাখিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

অন্ধকার ঘরে প্রভাবতী শয্যায় উঠিয়া বসিল; কিছুক্ষণ কান পাতিয়া রহিল। তারপর নিঃশব্দে উঠিয়া নবগোপালের ঘরে উঁকি মারিল। নবগোপালের ঘরে ক্ষীণ নৈশ দীপ জ্বলিতেছে। নবগোপাল শয্যায় নিদ্রামগ্ন। তাহার অল্প অল্প নাক ডাকিতেছে।

ফিরিয়া আসিয়া প্রভাবতী নিজের স্নান-ঘরের বন্ধ দ্বারে কান লাগাইয়া শুনিল। শব্দ নাই। তখন সে সন্তর্পণে বাহিরের দ্বার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইল। বারান্দার অপর প্রান্তে একটা ঘর। নিঃশব্দ পদে বারান্দা অতিক্রম করিয়া সে দ্বারের গায়ে হাত রাখিল। দ্বার ভেজানো ছিল, আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল।

প্রভাবতী দীপহীন কক্ষে প্রবেশ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রভাবতী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল, স্নানঘরের দ্বার খুলিয়া দেখিল ময়না মাটিতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে জাগাইয়া দিয়া সদয়কণ্ঠে বলিল—'যা—এবার নীচে যা।'

ময়না চলিয়া গেলে প্রভাবতী স্নান করিল। তারপর পানের বাটা লইয়া পান সাজিতে বসিল।

নায়েব আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন। 'কাল না কি মা তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল?'

প্রভাবতী মুখ না তুলিয়া বলিল—'এমন কিছু নয়, আজ ভাল আছি।—কাকা, ওই নতুন চাকরটাকে আজই বিদেয় করে দেবেন।'

নায়েব বলিলেন—'কাকে—মোহনকে? কিন্তু কাজকর্ম তো ভালই করছে শুনেছি।'

প্রভাবতী বলিল—'আমি ভেবে দেখলুম, অন্দর মহলে পুরুষ চাকর না রাখাই ভাল। ওকে পুরো মাসের মাইনে দিয়ে বিদেয় করে দেবেন। বলবেন যেন আমার জমিদারীর এলাকা ছেড়ে চলে যায়।'

কাহিনী শেষ করিয়া ভুবনবাবু এক টিপ নস্য লইলেন এবং চকিত সজল নেত্রে চারিদিকে চাহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'নবগোপাল কবে মারা গেল?'

ভুবনবাবু বলিলেন—'এই তো বছর দুই আগে। লোকটা ভারি অমায়িক ছিল, ছেলেকে খুব আদর করত।'

প্রশ্ন করিলাম—'আপনি ছাড়া একথা কে কে জানে?'

ভুবনবাবু বলিলেন—'সবাই জানে আবার কেউ জানে না। বড় ঘরের বড় কথা।'

কল্পনা

চিরযৌবনবাবুর আসল নাম অনেকেই জানেন না, আমাদেরও জানিবার প্রয়োজন নাই। 'চিরযৌবন' তাঁহার সাহিত্যিক ছদ্মনাম। এই নামে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে কীর্তি অর্জন করিয়াছেন।

চিরযৌবনবাবুর বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। পঁচিশ বছর পূর্বে যে নবীন বিদ্রোহীর দল বাঙলা সাহিত্যে নূতনত্বের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদেরই একজন। তারপর বন্যার তোড়ে অনেকেই ভাসিয়া গিয়াছেন; মুষ্টিমেয় যে কয়জন স্বকীয়তার বলে টিকিয়া আছেন, চিরযৌবনবাবু তাঁহাদের অগ্রণী। এখনও তাঁহার লেখায় দুর্দম যৌবনের তেজ ও বিদ্রোহিতা বিচ্ছুরিত হয়। তিনি নামেও যেমন, অন্তরেও তেমনি—চিরযৌবন।

চিরযৌবনবাবু বিপত্নীক। জীবনের মাত্র দুই-তিনটা বছর তাঁহার স্ত্রীসংসর্গ ঘটিয়াছিল, অন্যথা প্রায় সারাজীবনই একাকী কাটিয়াছে। একাকিত্বে তিনি অভ্যস্ত। কলিকাতার একটি মধ্যমশ্রেণীর দেশী হোটেলের ত্রিতলের ছাদে একটিমাত্র ঘর, সেই ঘরটিতে তিনি থাকেন। ঘরটির আসবাবপত্রে দেয়ালের ছবিতে শৌখিনতার ছাপ আছে, যদিও তাহা দুর্মূল্য শৌখিনতা নয়। সাহিত্যজীবী মানুষ অনাড়ম্বরভাবে যতখানি শৌখিনতা করিতে পারে, ততখানিই। হোটেলের ম্যানেজার তাঁহাকে স্থায়ী বাসিন্দারূপে পাইয়া গৌরব অনুভব করেন এবং ভৃত্যেরা তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য ছুটাছুটি করে। চিরযৌবনবাবু সুখে আছেন।

কখনও গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সমকালীন সাহিত্যবন্ধুদের সমাগম হয়।

খোলা ছাদের উপর মাদুর পড়ে, চা ও সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস সুরভিত হয়। চিরযৌবনবাবু হয়তো নিজের সদ্য-রচিত গল্প পাঠ করেন। তারপর আবার একাকী। কল্পনার সমুদ্রে যৌবনের স্বপ্নভরা সোনার তরী ভাসিয়া চলে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় চিরযৌবনবাবু বেড়াইতে বাহির হইতেছিলেন। ফাগুন মাস, কিন্তু এখনও সন্ধ্যার পর একটু ঠাণ্ডা পড়ে। পাটভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবির উপর আলোয়ানটা কাঁধে ফেলিয়া তিনি আয়নার দিকে চাহিলেন। ছিমছাম গৌরবর্ণ চেহারা, মুখের চামড়া এখনও কুঞ্চিত হয় নাই, মাথার চুল বারো আনা কাঁচা আছে। তিনি বুরুশ দিয়া চুলগুলিকে আরও চিক্কণ করিয়া তুলিলেন, সরু গোঁফের উপর একবার আঙুল বুলাইলেন। তারপর দ্বারে তালা লাগাইয়া বাহির হইলেন।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে তাঁহার কণ্ঠে গানের কলি গুঞ্জরিত হইতে লাগিল—বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল—

হোটেলের সদর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তার উপর; সেখান হইতে কুড়ি পঁচিশ কদম দূরে বড় রাস্তার মোড়। চিরযৌবনবাবু হোটেল হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তার দিকে চলিলেন। মাইল খানেক দূরে একটি পার্ক আছে। সেখানে বেঞ্চির উপর বসিয়া একটি সিগারেট সেবন করিবেন, তারপর আবার বাসায় ফিরিবেন।

তখনো রাস্তার আলো জ্বলে নাই। দিনের আলো মৌমাছি-ছোঁয়া লজ্জাবতী লতার মত মুদিয়া আসিতেছে। চিরযৌবনবাবু মোড় ঘুরিতে গিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঠিক মোড়ের উপর ল্যাম্পপোস্টের নীচে একটি যুবতী দাঁড়াইয়া আছে।

যুবতী চিরযৌবনবাবু অনেক দেখিয়াছেন, আজকাল রাস্তাঘাটে যুবতী দেখার কোনই অসুবিধা নাই। কিন্তু তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং নির্নিমেষ নেত্রে যুবতীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

যুবতীর চেহারা ভাল। রঙ ফরসা, চোখ ও নাক যেমন ধারালো, গাল ও ঠোঁট তেমনি নরম। গড়ন মোটাও নয়, রোগাও নয়, শাঁসে-জলে। ঘাড়ের উপর খোঁপাটি এমনভাবে বাঁধা যেন খুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। পরনে ফিকা নীল রঙের জর্জেট। বুকের কাছে দুই বাহুর মধ্যে বালিশের মত একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রচ্ছন্ন উদ্বেগভরা চোখে এদিক-ওদিক চাহিতেছে।

দুই মিনিট নিষ্পলক চাহিয়া থাকিবার পর চিরযৌবনবাবু সচেতন হইলেন। মেয়েটিও একবার তাঁহার দিকে ভ্রূ তুলিয়া চাহিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না, অসভ্যতা হয়। চিরযৌবনবাবু মেয়েটিকে পাশ কাটাইয়া একদিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কয়েক পা চলিবার পর কিন্তু তাঁহাকে থামিতে হইল। পিছন হইতে কেহ যেন রাশ টানিয়া ধরিয়াছে। রাস্তায় বেশী লোক ছিল না। চিরযৌবনবাবু কিছুক্ষণ নত-চক্ষে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ফিরিয়া চলিলেন।

মেয়েটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দিকে যতই তিনি অগ্রসর হইলেন ততই তাঁহার গতি শিথিল হইতে লাগিল; তারপর অজ্ঞাতসারেই তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

যুবতী আবার ভ্রূ বাঁকাইয়া তাঁহার পানে চাহিল; তাহার চোখে অস্বাচ্ছন্দ্য ভরা। চিরযৌবনবাবু ঈষৎ চমকিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি যুবতীর উপর আবদ্ধ হইয়া রহিল।

মোড় ঘুরিয়া তিনি হোটেলের দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন। যুবতী তাঁহার পানে চাহিয়া ছিল, চোখোচোখি হইতেই চোখ ফিরাইয়া লইল।

হোটেলের দ্বারের কাছে আসিয়া চিরযৌবনবাবুর ঘাড় আবার যুবতীর দিকে ফিরিল। সে এইদিকেই তাকাইয়া আছে। চিরযৌবনবাবুর বুকের ভিতরটা একবার প্রবলভাবে হাঁচোড় পাঁচোড় করিয়া উঠিল, তিনি হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি দ্বার ভেজাইয়া দিলেন। আলো জ্বালিলেন না, আলোয়ান আলনায় রাখিয়া আরাম-চেয়ারে অর্ধশয়ান হইলেন। আজ মনের এই বিহ্বলতার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সিগারেট ধরাইয়া তিনি আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুবতীটি সুন্দরী বটে। কিন্তু চিরযৌবনবাবু লুচ্চা-লম্পট নয়, তবে তাহাকে দেখিয়া তিনি এমন আত্মবিস্মৃত হইলেন কেন? হয়তো যুবতীর দেহে রূপ ছাড়াও প্রবল জৈব আকর্ষণ আছে। কিম্বা চিরযৌবনবাবুরই দেহ-মনে অনাস্বাদিত যৌবনের রস দীর্ঘকাল ধরিয়া বিন্দু বিন্দু সঞ্চিত হইতেছিল, আজ বসন্ত সমাগমে সহসা উছলিয়া উঠিয়াছে।

যুবতীর বাহুবন্ধনের মধ্যে বালিশের মত জিনিসটা বোধ হয় একটি শিশু।—কার শিশু?

চিরযৌবনবাবুর মন স্বভাবতই কল্পনা-প্রবণ। তাঁহার চিন্তা বাতাসের মুখে সাবান-বুদ্বুদের মত ভাসিয়া চলিল।

খুট্ খুট্—খুট্ খুট্। দ্বারে কে টোকা দিতেছে।

চিরযৌবনবাবু উঠিয়া দ্বার খুলিলেন। সেই যুবতী দাঁড়াইয়া আছে, বাহুবেষ্টনের মধ্যে কাপড় ঢাকা বালিশের মত পুঁটুলিটি। ভীরু কণ্ঠে বলিল—'আপনি কি চিরযৌবন—বাবু?'

চিরযৌবনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ।'

'ভেতরে আসতে পারি?' মেয়েটির গলা কাঁপিয়া গেল।

'আসুন।'

মেয়েটি সঙ্কোচভরে ঘরে প্রবেশ করিল, চিরযৌবনবাবু একটি চেয়ার তাহার দিকে আগাইয়া দিলেন।

সে চেয়ারে বসিল না, ঘরের এক পাশে একটি চৌকি ছিল, তাহার উপর আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিল, পুঁটুলিটিকে কোলে শোয়াইয়া দিয়া মুখ তুলিল।

চিরযৌবনবাবু বলিলেন—'আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু আজ বোধ হয় মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।'

মেয়েটি ঘাড় কাত করিয়া বলিল—'হ্যাঁ, আপনাকে কিন্তু আমি দেখেই চিনতে পেরেছি। আপনার লেখা আমার খুব ভাল লাগে।'

চিরযৌবনবাবু একটু সলজ্জতার অভিনয় করিলেন, বলিলেন—'তৃপ্তি পেলাম। আপনি কি—?'

'আমাকে আপনি বলবেন না, তুমি বলুন।'

'তা আচ্ছা। বয়সে আমি যখন বড়—'

'এমন কী বড়? আমার বয়স তেইশ।'

চিরযৌবনবাবু নিজের বয়স বলিলেন না, প্রশ্ন করিলেন—'তোমার নাম কি?'

'কল্পনা।'

চিরযৌবনবাবু স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার গল্প-উপন্যাসে কল্পনা নামে কোনও চরিত্র আছে কিনা। না, নাই, নূতন নাম।

'তুমি মোড়ে দাঁড়িয়ে কারুর জন্যে অপেক্ষা করছিলে বুঝি?'

কল্পনা মুখ নত করিল, তাঁহার কপাল ও গাল দুটি ধীরে ধীরে রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। চিরযৌবনবাবু বুকের কাছে সূচি-বিদ্ধবৎ একটু জ্বালা অনুভব করিলেন।

'স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছিলে?'

কল্পনা চকিতে চোখ তুলিয়া আবার নত করিল।

'আমার বিয়ে হয়নি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর চিরযৌবনবাবু লক্ষ্য করিলেন, কল্পনার কোলে বস্ত্রপিণ্ডটি অল্প অল্প নড়িতেছে, একটি শীর্ণ কাকুতি শোনা গেল।

'বাচ্ছাটির বয়স কত?'

'দশ দিন।'

'দশ দিন!—এ—কার বাচ্ছা?'

কল্পনা বিদ্রোহভরা সুরে বলিল—'আমার।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। শিশু পুনশ্চ আকুতি জানাইল। চিরযৌবনবাবু বলিলেন—'ওর বোধহয় ক্ষিদে পেয়েছে।'

কল্পনা বলিল—'হ্যাঁ, ক্ষিদে পেলে উসখুস করে।'

'তা—ওকে কিছু খেতে দেওয়া দরকার। কি দেবে? আমার ঘরে টিনের দুধ আছে।'

'এখনও টিনের দুধ খেতে শেখেনি।'

কল্পনা চিরযৌবনবাবুর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। তিনি ক্ষণেক বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলেন।

দশ মিনিট পরে কল্পনা আবার সামনে ফিরিয়া বসিল। পূর্ণোদর শিশু আর কোনও গণ্ডগোল করিল না।

চিরযৌবনবাবু একটু কাশিয়া বলিলেন—'তুমি কেন আমার কাছে এসেছ বললে না তো। কিছু চাই কি?'

কল্পনা ব্যগ্র চক্ষে চাহিয়া বলিল—'চাই। আজ রাত্রির জন্তে আমাদের আশ্রয় দিতে হবে।'

'তা—তোমার কি আর কোথাও যাবার নেই ?'

'না। শুনবেন আমার ইতিহাস ? নতুন কিছু হয়তো নয়, কিন্তু শুনলে আপনি বুঝবেন। আমি জানি যৌবনের স্বভাবধর্মকে আর যে যা বলে বলুক, আপনি কখনও অপরাধ বলে মনে করবেন না।'

চিরযৌবনবাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'না, যৌবনের স্বধর্মকে আমি অপরাধ বলে মনে করি না। বরং যারা যৌবনকে জোর করে পীড়ন করতে চায়, অপরাধী তারাই।'

কল্পনা প্রদীপ্ত চক্ষে বলিল—'তাই তো আপনার লেখা এত ভালবাসি—আপনি চিরযৌবন। এখন আমার ইতিহাস বলি। এই কলকাতা শহরেরই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে আমি। ঘরে সৎমা আছেন। বিয়ে দেবার পয়সা বাবার নেই, তাই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।

'একজনকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা হয়তো মনস্তত্ত্ববিদেরা জানেন। তার কতখানি দৈহিক আকর্ষণ, কতখানি মানসিক, তা বিচার করার মত বুদ্ধি আমার নেই। বোধ হয় ডি এল রায়ের কথাই ঠিক—যখন থাকে না future-এর চিন্তা থাকে না ক' shame, তারেই বলে প্রেম। আমারও সাময়িকভাবে সেই অবস্থা হয়েছিল। বিয়ে হবার উপায় ছিল না, জাতের তফাত। লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দেখা হত। একবার স্বামী-স্ত্রী সেজে এক রাত্রি একটা হোটেলে ছিলাম। তারপর—

'সৎমা জানতে পারলেন, বাবার কানে উঠল। আমার তখন future-এর চিন্তা ফিরে এসেছে, প্রেমাস্পদকে বললাম—আমাকে

বাঁচাও। উত্তরে প্রেমাস্পদ তার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র আমার হাতে দিল। তাকে দোষ দিই না। কারণ বিয়ের কথা তার সঙ্গে কোনও দিন হয়নি।

'তারপর যথাসময়ে বাবা আমাকে মেটার্নিটি হোমে ভর্তি করে দিয়ে বলে গেলেন—আর বাড়িতে ফিরে যেও না।

তারপর আজ দশ দিন পরে মাতৃত্বের নিদর্শন নিয়ে মাতৃসদন থেকে বেরিয়েছি।'

কল্পনা চুপ করিল। চিরযৌবনবাবু সিগারেট ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিলেন। পাঁচ মিনিট পরে সিগারেটের টোটা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—'আজ মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? মনে হচ্ছিল কারুর জন্য অপেক্ষা করছ।'

কল্পনা বলিল—'না। মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আমার মত মেয়েকে আশ্রয় দিতে পারে এমন কেউ রাস্তা দিয়ে যায় কিনা। তারপরেই আপনাকে দেখতে পেলাম। আপনার অনেক ছবি দেখেছি, চিনতে কষ্ট হল না। ভাবলাম, একটা রাত্রির জন্য যদি কেউ আশ্রয় দিতে পারে তো সে আপনি। তাই এসেছি। দেবেন আশ্রয়?'

চিরযৌবনবাবু উঠিয়া গিয়া কল্পনার কাঁধের উপর হাত রাখিলেন—'শুধু এক রাত্রির জন্য নয়, সারা জীবনের জন্যে যদি আশ্রয় চাও, তাও দিতে পারি।'

কল্পনা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া বিভক্ত ওষ্ঠাধরে চাহিল—'সত্যি বলছেন?'

চিরযৌবনবাবু হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন দমন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ। কিন্তু আমার বয়স হয়েছে—'

উদ্দীপ্তকণ্ঠে কল্পনা বলিল—'কে বলে বয়স হয়েছে? আপনি চিরযুবা—চিরনবীন—'

ঠক্ ঠক্ ! ঠক্ ঠক্—!

রূঢ় শব্দে চিরযৌবনবাবু ধড়মড় করিয়া ইজি চেয়ারে উঠিয়া বসিলেন। কেহ দ্বারের কড়া নাড়িতেছে। তাঁহার কল্পনার সাবান-বুদ্বুদ এই শব্দের আঘাতে ফাটিয়া গেল।

আলো জ্বালিয়া তিনি দ্বার খুলিলেন।

সামনে দাঁড়াইয়া আছে সেই যুবতী যাহাকে ঘিরিয়া তিনি এতক্ষণ কল্পনার জাল বুনিতেছিলেন। সঙ্গে এক যুবা। প্যাণ্টলুনের উপর পুল্-ওভার; ডাম্বেলভাঁজা চেহারা। চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

যুবতীর বুকের কাছে কাপড়ের পুঁটুলি; সে এক হাত মুক্ত করিয়া চিরযৌবনবাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—'এই বুড়োটা!'

যুবক উগ্রস্বরে বলিল—'কি রকম জানোয়ার তুমি হে! বুড়ো হয়েছ এখনও ভদ্রতা শেখোনি? ভদ্রমহিলা একলা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর তুমি ড্যাম্ স্কাউণ্ড্রেল্—'

মহিলা বলিলেন—'আমার পম্‌পম্‌এর অসুখ করেছে তাই, নইলে কুকুর লেলিয়ে দিতুম।'

পম্‌পম্ নামধারী ক্ষুদ্র কুকুর নিজের নাম শুনিয়া যুবতীর বাহুবদ্ধ বস্ত্রপিণ্ডের ভিতর হইতে ঝাঁকড়া মাথা তুলিল, চিরযৌবনবাবুকে ধমক দিয়া বলিল—'ভুক্ ভুক্—'

চিরযৌবনবাবু অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সময় হোটেলের ম্যানেজার উপরে আসিয়া বলিলেন—'কি হয়েছে মশাই? কি হয়েছে—?'

যুবক বলিল—'এই বুড়োটা। আমার স্ত্রীকে অপমান করেছে। আমার কুকুরটার অসুখ করেছিল, তাই আমার স্ত্রী তাকে নিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমার অফিস থেকে

ফিরতে দেরি হচ্ছিল, ইতিমধ্যে এই বুড়োটা—' যুবক চিরযৌবনবাবুর দিকে ঘুষি পাকাইয়া বলিল—'বুড়ো বলে বেঁচে গেলে, নইলে আজ ঠেঙিয়ে পাট করে দিতুম।'

ম্যানেজার বলিলেন—'হাঁ হাঁ, বলেন কি, উনি একজন বিখ্যাত—'

যুবক বলিল—'ড্যাম বিখ্যাত। ডোম চাঁমার লোচ্চা—

চিরযৌবনবাবু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘর অন্ধকার করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। ওই বুড়োটা! ওই বুড়োটা! ওই বুড়োটা!—তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি বুড়া হইয়াছেন, সকলেই তাহা দেখিতে পাইতেছে। অথচ—প্রকৃতির এ কি পরিহাস! তাঁহার মন বুড়া হয় নাই কেন? মন কেন এখনও সরস সজীব আছে, যৌবনের রঙীন নেশায় বিভোর হইয়া আছে?

কেন? কেন? এ কি দুর্বিষহ বিড়ম্বনা!

অপদার্থ

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল অল্পাধিক চল্লিশ বছর আগে। তাহাও আবার বিহার প্রদেশের অজ পাড়াগাঁয়ে। সুতরাং ইহাকে আদিম কালের কাহিনী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

গঙ্গার তীরে চরের উপর গ্রাম—দিয়ারা মনপথল। সহর হইতে চৌদ্দ পনরো মাইল দূরে। সভ্যতার আলো এখানে মৃৎপ্রদীপের শিক্ষা হইতে বিকীর্ণ হয়, কদাচিৎ হ্যারিকেন লণ্ঠনের ধোঁয়াটে কাচের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তবু গ্রামটি সমৃদ্ধ। প্রায় তিন শত ঘর ভুঁইয়া রাজপুত এখানে বাস করে।

সম্পৎ সিং এই গ্রামে বর্ধিষ্ণু জোতদার, দেড়শত বিঘা জমি চাষ করেন। গৃহে লক্ষ্মীর কৃপা উছলিয়া পড়িতেছে। পঞ্চাশ বছর বয়স, গ্রামের সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া চলে, বিপদে আপদে তাঁহার পরামর্শ ও সহায়তা অন্বেষণ করে। কিন্তু তাঁহার মনে সুখ নাই, একমাত্র পুত্র ভূপৎ সিং মানুষ হইল না।

ছেলেবেলা হইতেই ভূপতের স্বভাব কেমন এক রকম; কিছুতেই যেন আঁট নাই। তাহার স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু খেলাধূলায় তাহার মন নাই; লেখাপড়া ও না মা সি ধং পর্যন্ত করিয়া গুরুজির পাঠশালা ছাড়িয়া দিয়াছে। গ্রাম্য বড় মানুষের ছেলে অল্পবয়সে বখিয়া গেলে ভাঙ্‌ এবং গাঁজা ধরে, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ ইয়ার্কির সম্বন্ধ পাতে। কিন্তু ভূপতের সে সব দোষ নাই, সে শুধু কাজ করিতে নারাজ।

অথচ গৃহস্থের সংসারে কত না কাজ। ক্ষেতে গিয়া চাষবাস তদারক করিতে হয়, ঘরে বসিয়া হিসাব নিকাশ করিতে হয়। যাহার দু'চার বিঘা জমিজমা আছে তাহারই মামলা মোকদ্দমা আছে, সহরে গিয়া উকিল মোক্তারের সহিত দেখা করিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করা প্রয়োজন। কিন্তু এই সব কাজ সম্পৎ সিংকে নিজেই করিতে হয়, উপযুক্ত পুত্র থাকিয়াও নাই।

পুত্রের চৌদ্দ বছর বয়স হইতেই সম্পৎ সিং তাহাকে সংসারে ছোট খাটো কাজে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। পিতার আজ্ঞায় ভূপৎ যথাসাধ্য উৎসাহ সংগ্রহ করিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু অল্পকাল পরেই তাহার উৎসাহ ফুরাইয়া যাইত, মন উদাস হইয়া পড়িত। একবার সম্পৎ সিং তাহাকে লইয়া মামলার তদ্বির করিতে সহরে গিয়াছিলেন। টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া সহরে যাইতে মন্দ লাগে নাই; কিন্তু তারপর সারা দিন আদালতে উকিলের পিছু পিছু ঘুরিয়া এবং মামলা মোকদ্দমার অবোধ্য কচ্‌কচি শুনিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর আবার সহরে যাইবার প্রস্তাব হইলে সে লুকাইয়া বসিয়া থাকিত। সম্পৎ সিং হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

পুত্রের সতরো বছর বয়সে সম্পৎ সিং তাহার বিবাহ দিলেন। বধূটির নাম লছমী, যেমন সুন্দরী, তেমনি মিষ্ট-স্বভাব; বয়স চৌদ্দ বছর, সেয়ানা হইয়াছে। সম্পৎ সিং ভাবিলেন, নিজের সংসার হইলে ভূপতের সংসারে মন বসিবে। কিন্তু হায় রাম! ভূপতের কর্মজীবনে তিলমাত্র পরিবর্তন দেখা গেল না। বরং আগে যদি বা নৈষ্কর্ম্যের পীড়নে উত্যক্ত হইয়া সে ক্ষেত খামারের দিকে পা বাড়াইত, এখন নিরবচ্ছিন্ন ঘরের কোণে আড্ডা গাড়িল।

লছমী মেয়েটি বড় বুদ্ধিমতী। সে দু'চার মাসের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ীর হালচাল বুঝিয়া লইল। শ্বশুরের দুঃখ অনুভব করিল, স্বামীও যে সুখী নয় তাহা অনুমান করিল। কিন্তু কেন যে স্বামীর মন কর্মবিমুখ তাহা বুঝিতে পারিল না। নির্জনে সে চোখের জল ফেলিয়া ভাবিত—পাড়াপড়শী মেয়েরা বলে, তাহার স্বামী অলস অপদার্থ অকর্মণ্য, তাহা সত্য নয়, তাহার স্বামী মানুষের মত মানুষ। কেবল নিয়তির দোষে এমন হইয়াছে। হে ভগবান, তুমি আমার স্বামীর নিয়তির দোষ কাটাইয়া দাও, আমি বুকের রক্ত দিয়া পূজা দিব।

ভূপতের নিয়তির দোষ কিন্তু কাটিল না। বছরের পর বছর কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ভূপৎ গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোনও কাজই করিল না।

ভূপতের বিবাহের আট বছর পরে একটি ঘটনা ঘটিল। ভূপতের বয়স তখন পঁচিশ, সে চারিটি সন্তানের পিতা। সম্পৎ সিংয়ের বয়স ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু তিনি এখনও সমস্ত সংসারের কর্মভার একাই বহন করিতেছেন।

গ্রামে একটি যাযাবর বায়স্কোপ কোম্পানী আসিল। তখন নির্বাক চলচ্চিত্র দেশে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। লাইম্‌-লাইটের পরিবর্তে বিদ্যুৎ বাতির সাহায্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রচলিত হইয়াছে। একদল ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন উৎসাহী লোক গরুর গাড়ীতে যন্ত্রপাতি লইয়া গ্রামে গ্রামে বায়স্কোপ দেখাইয়া ফিরিতেছে এবং প্রচুর পয়সা পিটিতেছে। এক আনা দু'আনার টিকিট, বাইশকোপ দেখিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে ছেলেবুড়ো ভাঙিয়া পড়ে।

গ্রামের মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর ডায়নামো চালাইয়া বিদ্যুৎ বাতি জ্বালা হইল। বিদ্যুৎ বাতি গ্রামের কেহ পূর্বে দেখে নাই, আলো

দেখিয়াই সকলের চক্ষু স্থির। তারপর যখন ছবি দেখিল তখন আর কাহারও মুখে বাক্য রহিল না।

ভূপৎও ছবি দেখিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার চক্ষে ছবির চেয়ে বিদ্যুতের আলোই বেশী সম্মোহন বিস্তার করিয়াছিল। একি অপূর্ব আলো! এমন আলো মানুষ জ্বালিতে পারে! কেমন করিয়া জ্বালে? তেল নাই, দেশলাই নাই, ফুঁ দিলে নেভে না, দেয়াল টিপিলেই জ্বলিয়া ওঠে!

রাত্রে ভূপৎ ভাল ঘুমাইতে পারিল না। যখন ঘুমাইল তখন দেখিল শত শত হুরীপরী বিজ্‌লি-বাতির মত ভাস্বর মূর্তিতে তাহাকে ঘিরিয়া নাচিতেছে। জাগিয়া দেখিল ঘরের কোণে রেড়ির তেলের মিটিমিটি আলো। কনুয়ে ভর দিয়া উঠিয়া সে লছমীর ঘুমন্ত মুখ দেখিল। না, এ আলোতে লছমীর মুখ ভাল দেখায় না, ওই আলো জ্বালিয়া লছমীর মুখ দেখিতে হয়। গাঢ় আবেগ ভরে সে লছমীর শিথিল অধরে চুম্বন করিল, লছমী আধ-জাগ্রত হইয়া তাহার গলা জড়াইয়া লইল।

সকালে ভূপৎ গিয়া বাইশকোপের মিস্ত্রির সহিত ভাব করিয়া ফেলিল, তাহাকে পেঁড়া গুলাবজামুন খাওয়াইল। মিস্ত্রি যত্ন করিয়া তাহাকে বিদ্যুজ্জনন যন্ত্র দেখাইল এবং প্রক্রিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল। ভূপৎ কিছুই বুঝিল না কিন্তু চমৎকৃত হইয়া রহিল।

ব্যবসা এখানে ভাল চলিতেছে দেখিয়া বাইশকোপের দল দুই তিন দিন থাকিয়া গেল। তারপর একদিন সকালবেলা মালপত্র যন্ত্রপাতি গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া প্রস্থান করিল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল ভূপৎ গ্রামে নাই। বাইশকোপ দলের সঙ্গে সঙ্গে সেও অন্তর্ধান করিয়াছে।

সে রাত্রে বেশী খোঁজ খবর লওয়া চলিল্ না। পর দিন প্রাতে সম্পৎ সিং চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। কয়েক মাইল দূরের একটি গ্রামে

বাইশকোপ দলের সন্ধান মিলিল, কিন্তু ভূপৎকে পাওয়া গেল না। সে তাহাদের সঙ্গে আসে নাই।

সম্পৎ সিং অতিশয় কাতর হইলেন, নাতি নাতিনীদের কোলে লইয়া 'বাবুয়া রে' 'বাবুয়া রে' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একে পুত্রস্নেহে তাঁহার হৃদয় বিকল, উপরন্তু তাঁহারই কোন অনীপ্সিত অবহেলার ফলে ভূপৎ অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়াছে এই কথা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

লছমী কিন্তু কাঁদিল না, সে শক্ত রহিল। ভূপৎ তাহাকে কিছু বলিয়া যায় নাই, কিন্তু সে মনে মনে বুঝিয়াছিল। শ্বশুরের কান্নাকাটি দেখিয়া সে দ্বারের আড়াল হইতে নিম্নস্বরে বলিল—'বাবুজি হয়রাণ হবেন না, কোনও ভয় নেই।'

সম্পৎ সিং চক্ষু মুছিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন—'বেটি, তুমি কিছু জানো? কেন সে চলে গেল? কোথায় চলে গেল?'

লছমী বলিল—'জানি না। কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না, উনি শিগ্‌গির ফিরে আসবেন।'

পুত্রবধূর দৃঢ়তায় সম্পৎ সিং আশ্বাস পাইলেন।

কিন্তু ছয় মাস কাটিয়া গেল, ভূপতের দেখা নাই। সম্পৎ সিং আবার ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। লছমীর মনেও অজানিত আশঙ্কার স্পর্শ লাগিল।

তারপর হঠাৎ একদিন ভূপৎ ফিরিয়া আসিল। ছোট বড় করিয়া চুল ছাটা, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, একমুখ হাসি। ভূপৎ যেন আর সে ভূপৎ নয়, আহার আকৃতি-প্রকৃতি সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে।

ভূপৎ পিতার পদধূলি লইল। সম্পৎ সিং 'বাবুয়ারে—' বলিয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন।

অতঃপর তিনি একটু শান্ত হইলে ভূপৎ গত ছয় মাসের কাহিনী বলিল।—বাইশকোপ দলের মিস্ত্রির নিকট ঠিকানা জানিয়া লইয়া সে কলিকাতায় গিয়াছিল। কলিকাতায় একটি ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর কারখানায় চাকরি লইয়া বিদ্যুৎ বিদ্যা শিখিয়াছে। কোম্পানীর বড় সাহেব বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাহার সহজাত বুদ্ধি দেখিয়া তাহাকে চাকরি দিয়াছেন। শীঘ্রই পাটনায় বিদ্যুৎ বাতি আসিবে, ভূপৎ কোম্পানীর পক্ষ হইতে পাটনায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও মেরামতির দোকান খুলিবে। পঞ্চাশ টাকা মাহিনা ও কমিশন।

সম্পৎ সিং বলিলেন—'বেটা, তুমি পরের নৌকরি করবে কেন? তোমার কি পয়সার অভাব?'

ভূপৎ বলিল—'পয়সার জন্যে নয় পিতাজি, আমি বিজ্‌লির কাজ করব। বিজ্‌লির কাজ করতে আমি ভালবাসি। পাটনায় বাসা ঠিক করে আমি আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। বুত্‌রুদেরও নিয়ে যাব।'

সম্পৎ সিং তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'তোমার যে-কাজ ভাল লাগে তাই কর বেটা। আমিও তোমার সঙ্গে পাটনা যাব, তোমার ঘর-বসত করে দিয়ে আসব।'

পরদিন ভূপৎ পিতা ও স্ত্রীপুত্র লইয়া পাটনা চলিয়া গেল। ভূপতের অপদার্থ নাম ঘুচিয়াছে, সে তাহার স্বধর্ম খুঁজিয়া পাইয়াছে।

ভাবিতেছি, ভূপৎ যদি শতবর্ষ পূর্বে, এমন কি পঞ্চাশ বছর পূর্বেও জন্ম গ্রহণ করিত তাহা হইলে কী হইত? তখন বিদ্যুৎ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, ভূপৎ সম্ভবত নিষ্কর্মা অপদার্থ বদনাম লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিত। বর্তমানেও এমনি কত অপদার্থ মানুষ অজ্ঞাত ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া নিষ্ক্রিয় নিরর্থক জীবন কাটাইয়া দিতেছে কে তাহার হিসাব রাখে?

নিরুত্তর

উত্তরাঞ্চলের একটি শহরে আমি কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম। গঙ্গার তীরে শহর। বাঙালী দু'চার ঘর আছেন। আমার কিন্তু কেবল একটি বাঙালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাঁহার নাম নৃসিংহ পাল। আমার বাসার পাশেই ছোট একটি বাড়ীতে বাস করিতেন।

নৃসিংহবাবুর মত এমন কদাকার চেহারা খুব কম দেখা যায়। গোরিলার মত পাশবিক একখানা মুখ, ছোট ছোট ক্রূর চক্ষু; মাথার চুল পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে, তবু শোরকুচির মত খাড়া হইয়া আছে। বয়স বোধহয় ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু শরীর অসুরের মত নিরেট। প্রথম যেদিন তাঁহাকে দেখি, আমার হৃৎপিণ্ড সন্ত্রাসে লাফাইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার চেহারার জন্যই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক, বেশী লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা ছিল না। তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় দুইবার গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, তা ছাড়া আর বাড়ীর বাহির হইতেন না। তাঁহার বাড়ীতে অন্য কাহাকেও আসিতে দেখি নাই। কেবল খোঁড়া মানিক নামক এক ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকিয়া মাঝে মাঝে আসিত।

আমি নিজের পড়াশুনা লইয়া থাকিতাম, নৃসিংহবাবুর সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে যাই নাই। তাঁহার চেহারা যদি তাঁহার চরিত্রের দর্পণ হয় তবে পরিচয় না হওয়াই ভাল। কিন্তু তিনি একদিন নিজে আসিয়া আলাপ করিলেন। আমার চাকর পালাইয়াছিল; আমি নিতান্ত অসহায়ভাবে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, চাকর পালাইলে যদি এমন হাঁড়ির

হাল হয় তবে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া কী লাভ হইল, এমন সময় নৃসিংহবাবু আসিয়া বলিলেন, 'চাকর পালিয়েছে! কিছু ভাববেন না, কালই নতুন চাকর জোগাড় করে দেব। আজ আমার চাকর এসে আপনার সব কাজ করে দিয়ে যাবে।'

নৃসিংহবাবুর কণ্ঠস্বর অতি মধুর, ভরাট এবং মধুর; শানাই বাঁশীর খাদের পর্দার মত। চেহারার সঙ্গে যেন ঠিক খাপ খায় না।

অতঃপর তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইল। তিনি দু'বেলা গঙ্গাস্নান করেন অথচ পূজার্চনা কিছুই করেন না, ধর্মের প্রসঙ্গও কখনও উত্থাপন করেন না, দেখিয়া শুনিয়া বড় আশ্চর্য মনে হইত। তাঁহার চেহারা ক্রমশ সহ্য হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার চরিত্র ভাল কি মন্দ তাহা নিঃসংশয়ভাবে ধরিতে পারিতেছিলাম না। হয়তো লুকাইয়া মদ খান, অন্য দোষও আছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি কখনও কাহাকেও কষ্ট দিতে চাহিতেন না এবং কাহারও কষ্ট দেখিলে সাধ্যমত প্রতীকারের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতিগোষ্ঠী কেহ ছিল না, একাকী বাস করিতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ভ্রমণে বাহির হইয়া বাসা হইতে একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। শীতের সন্ধ্যা, রাস্তায় লোকজন নাই; এমন একটা স্থানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম যেখানে তিন-চারিটা রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কোন্ রাস্তা ধরিলে বাসায় ফিরিয়া যাইতে পারিব ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছি না, এমন সময় দেখিলাম নৃসিংহবাবু গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহার পা খালি, গায়ে একটা আলোয়ান, হাতে গামছা-জড়ানো ভিজা কাপড়।

দু'জনে পাশাপাশি ফিরিয়া চলিলাম। এদিকটায় পূর্বে আসি নাই, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গঙ্গার ঘাট এখান থেকে কতদূর?'

'মাইল খানেক।'

'রোজ দু'বেলা এখানে আসেন?'

'হ্যাঁ।'

একটু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিলাম, 'কাছাকাছি অন্য ঘাট আছে, সেখানে যান না কেন?'

তিনি বলিলেন, 'এটা শ্মশান ঘাট। এখানেই আসি।'

হঠাৎ মনে হইল, কাপালিক নাকি? কিন্তু কৈ, রুদ্রাক্ষের মালা, সিঁদুরের কৌটা, এসব তো কিছু নাই।

খানিকক্ষণ নীরবে চলিলাম। বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, তার উপর পথের পাশে বড় বড় গাছ। আকাশে একফালি চাঁদ আছে বটে; কিন্তু রাত্রির তিমির হরণ করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়।

লক্ষ্য করিলাম, নৃসিংহবাবু পথ চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া পশ্চাতে তাকাইতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি দেখছেন?'

'দেখুন তো পেছনে কেউ আসছে কিনা।'

হঠাৎ গা ছমছম করিয়া উঠিল। পশ্চাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, 'কৈ না।'

'কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কি?'

'না। কি ব্যাপার?'

'কিছু না। মাস কয়েক আগে এই জায়গায় দুটো শ্মশানের কুকুর একটা মুসলমান গুণ্ডার টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলেছিল।'

মিনিট দশেক পরে লোকালয়ের এলাকায় আসিয়া পড়িলাম, আরও পাঁচ মিনিট পরে নিজের পাড়ায় পৌঁছিলাম। নৃসিংহবাবুর বাড়ী আগে; তিনি বলিলেন, 'আসুন, চা খেয়ে যান।'

তাঁহার সদর ঘরে চৌকির উপর জাজিম পাতা। দুইজনে মুখোমুখি

বসিয়া গরম চা-পান করিতেছি। আমার মনে নৃসিংহবাবু সম্বন্ধে আজ আবার নূতন করিয়া নানা প্রশ্ন জাগিতেছে: লোকটি কেমন? বাহিরের সহিত ভিতরে সামঞ্জস্য কতখানি? এতদিনের আলাপেও আসল মানুষটাকে চিনিতে পারিতেছি না কেন?

নৃসিংহবাবু হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাসির আওয়াজ যেমন বংশী-মধুর, হাসিলে তাঁহার মুখের ভাব হয় তেমনি দংষ্ট্রাকরাল। হাসি থামাইয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি একটা ভয়ঙ্কর পাজি লোক।'

আমি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, 'না না, সে কি কথা—'

তিনি সহজ সুরে বলিলেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন। সত্যিই আমি ভয়ানক পাজি লোক। অন্তত বছর তিনেক আগে পর্যন্ত তাই ছিলাম। এখন মনটা বোধহয় কিছু বদলেছে, কিন্তু চেহারা বদলায় নি, যা ছিল তাই রয়ে গেছে।'

নৃসিংহবাবু নির্বিকার চিত্তেই কথাগুলি বলিলেন, আমি কিন্তু বিশেষ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম; চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে তুলিয়া লজ্জা ঢাকা দিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি বলিয়া চলিলেন, 'পরমা প্রকৃতি আমার সর্বাঙ্গে প্রকৃত পরিচয়ের ছাপ মেরে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে বেইমানি করিনি। এমন দুষ্কর্ম নেই যা করিনি; জগাই মাধাই আমার কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু। এইভাবেই জীবন কেটে যাচ্ছিল, তারপর একদিন একটা সামান্য ঘটনা ঘটল, তার ফলে সব ওলট পালট হয়ে গেল। ভাববেন না যে মনের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেল কিম্বা রাতারাতি সাধু সন্ন্যাসী হয়ে পড়লাম। দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়নি বেশী, আসলে বদলেছে এই জলজ্যান্ত পৃথিবীটা। শুনলে আশ্চর্য হবেন। সেই কথাই আজ আপনাকে বলব।'

'বলুন।'

এই সময় একটু বাধা পড়িল। বাহিরের দ্বার ভেজানো ছিল, তাহা কাহারও লঘু করস্পর্শে খুলিয়া গেল এবং একটি মানুষের মুখ ভিতরে উঁকি মারিল। পশমের টুপী ঢাকা মুখখানি অস্থিসার এবং ছুঁচালো, চক্ষু দুটি ভীরু ধূর্তামিতে ভরা। আমাকে দেখিয়াই মুখটি বাহিরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। যেন একটা পথের কুকুর খাদ্যের লোভে রান্নাঘরে উঁকি মারিয়াছিল, ভিতরে লোক আছে দেখিয়া পলায়ন করিল।

আমি চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ও কে?'

নৃসিংহবাবু হাসিলেন, 'ভূতপ্রেত নয়, মানুষ। ওর নাম খোঁড়া মানিক। ও একটি নিশাচর জীব। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে।'

'কিন্তু পালাল কেন?'

'আপনাকে দেখে পালালো। ও আমার কাছে আসে লুকিয়ে। শহরে একজন বড়লোক আছে, নাম রামনেহাল সিং; খোঁড়া মানিক তার মোসায়েব। রামনেহাল যদি জানতে পারে খোঁড়া মানিক আমার কাছে আসে, ওকে বেমালুম কেটে ফেলবে। ওকথা যাক। গল্পটি বলি শুনুন।'

নৃসিংহবাবু সদর দরজায় খিল দিয়া আসিয়া বসিলেন।

আমি পুলিশের দারোগা ছিলাম। হাউটার কনেষ্টবল হয়ে ঢুকি, বড় দারোগা পর্যন্ত উঠেছিলাম। আরও উঠতে পারতাম, ইচ্ছে করে উঠিনি। ওপরে আর মজা নেই।

আমার মতন দুর্দান্ত দারোগা পুলিশে আর ছিল না, এখনও বোধহয় নেই। যেমন কুচুটে বুদ্ধি তেমনি আইন বাঁচিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা। যাকে একবার ধরতাম, পিণ্ডি বার করে ছেড়ে দিতাম। চোর ছ্যাঁচড় দুষ্টু বজ্জাৎ লোক আমাকে যত ভয় করত, ভদ্রলোকেরা তার চেয়ে বেশী

ভয় করত। যখন যে মহকুমায় বদলি হয়ে যেতাম সেখানে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠত। বড়লোকেরা গায়ে পড়ে টাকা খাইয়ে যেত, যেন তাদের পেছনে না লাগি।

এইভাবে মনের সুখে আছি। বিয়ে করিনি; আমার মতন যাদের মনের ভাব তাদের বিয়ে করা বোকামি। মাইনে পাই সামান্যই কিন্তু উপরি আসে ছাপ্পর ফুঁড়ে। এখনও সেই টাকাই খাচ্ছি, আরও বিশ বছর যদি থাকি সে টাকা ফুরোবে না।

বাইরে বাঘের দাপট, ভেতরে মদ মাংস পঞ্চমকার। যা চাই সব পেয়েছি। মনের ফুর্তিতে আছি।

বছর আষ্টেক আগে এই শহরে বদলি হয়ে আসি, বড় থানার বড় দারোগা। শাঁসালো শহর, পয়সাওয়ালা লোক অনেক আছে। সকলের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। চুপি চুপি ভেট আসতে লাগল; যাদের পেটে ময়লা যত বেশী তারা ঠাকুরের মন্দিরে তত বেশী পূজা পাঠালো। কেবল একজন পাঠালো না, সে ঐ রামনেহাল সিং। রামনেহাল সিং-এর জমিদারী আছে, সুদের কারবারও করে; অঢেল টাকা। সে তেউড়ে বসে রইল, কিছু দিলে না।

মাসখানেক পরে একটা মামুলি কাজের অছিলায় তার বাড়ীতে গেলাম। ইশারায় জানালাম, টাকা চাই। সে স্পষ্ট মুখের ওপর বললে, তোমার মতন দারোগা ঢের দেখেছি। যা পারো কর গিয়ে, এস পি আমার মুঠোর মধ্যে।

মনে মনে বারুদ হয়ে ফিরে এলাম। দাঁড়াও যাদু, তোমাকে দেখাচ্ছি এস পি বড় না নর্সিং দারোগা বড়।

জাল বুনতে আরম্ভ করলাম। এই সব জমিদারদের আইনের ফাঁদে ফেলা শক্ত নয়, ছোটখাটো মামলায় সহজেই ফেলা যায়। কিন্তু আমি

ঠিক করেছিলাম, রামনেহাল সিংকে এমন মার দেব যে আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। একেবারে শিরদাঁড়া ভেঙে দেব।

খোঁড়া মানিক—যাকে এখনি দেখলেন—সে তখনও রামনেহালের মোসায়েব ছিল, রামনেহালের যত নোংরা কাজ সেই করত। তাকে একদিন ধরে ফেললাম। থানায় ডাকলাম না, বাড়ীতে ডেকে এনে দেখলাম সে যে-সব কাজ করেছে, তার জন্যে তাকে পাঁচ দফায় দশ বছর জেলে পাঠাতে পারি। খোঁড়া মানিক পা জড়িয়ে ধরল।

সেই থেকে খোঁড়া মানিক হল আমার গোয়েন্দা, গুপ্তচর। লুকিয়ে রাত্তিরে এসে আমাকে রামনেহালের হাঁড়ির খবর দিয়ে যেত। ওর মনে এমন ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম যে, সে-ভয় ওর এখনও যায়নি। আমার এখন চাকরি নেই, কোনও ক্ষমতা নেই ; কিন্তু ওর বিশ্বাস ইচ্ছে করলেই আমি ওকে জেলে পাঠাতে পারি। তাই মাঝে মাঝে আসে, খবর দিয়ে যায়।

সে যাক। দেড় বছর ধরে ধীরে ধীরে একটি মোকদ্দমা খাড়া করলাম। মোকদ্দমা নয়, একটি নিখুঁত শিল্পকর্ম। রামনেহালের ছেলের বয়স তখন উনিশ কুড়ি। সে বাজারের এক বেশ্যাকে খুন করেছে। সাক্ষী-সাবুদ দলিল-দস্তাবেজ একেবারে নিরেট, কোথাও বেরুবার পথ নেই।

রামনেহালের ছেলের চৌদ্দ বছর ম্যাদ হয়ে গেল। এস পি বাঁচাতে পারলেন না। কেবল কম বয়স বলে ফাঁসি হল না। সে ছেলে এখনও জেলে পচছে।

এই একটা নমুনা থেকে বুঝতে পারবেন আমি কি ধরণের লোক। তারপর কয়েক বছর কেটে গেল, আমার কাজ থেকে অবসর নেবার সময় হল। অনেক টাকা করেছি, কাজ করবার দরকার নেই। এক্সটেনশন্ নিতে পারতাম কিন্তু নিলাম না।

এই ছোট্ট বাড়ীখানা কিনেছিলাম। কাজ চুকিয়ে দিয়ে বাড়ীতে এসে বসলাম। মনে গর্বভরা আনন্দ। যা চেয়েছি তা পেয়েছি, কারুর কাছে হার মানিনি। আর কি চাই!

সন্ধ্যের পর এই ঘরে মদের বোতল নিয়ে বসেছি; আজ সারা রাত্রি একাই উৎসব চলবে। টোটা-ভরা পিস্তলটা হাতের কাছে আছে। শত্রু অনেক, কাজ ছেড়ে দিয়েছি বলে যদি কেউ দাদ্ তুলতে আসে তাকে দেখে নেব।

মশ্‌গুল হয়ে মদ খাচ্ছি। সময়ের হিসেব নেই। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি একটা বিকট চেহারা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রোগা সিড়িঙ্গে এক সন্নিসি; মাথায় জটা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, সারা গায়ে ছাই মাখা।

আমি অভ্যাসের বশেই খপ্ করে পিস্তলটা তুলে নিয়েছি, সন্নিসি ধমক দিয়ে উঠল—'বন্দুক রাখ্।'

—কী গলার আওয়াজ, যেন তোপ দাগলো। বললে বিশ্বাস করবেন না, পিস্তল আমার হাত থেকে খসে পড়ল, আমি ভেড়ার মত তাকিয়ে রইলাম।

সন্নিসি তখন বললে—'তোর সময় হয়েছে। রোজ দু'বেলা গঙ্গা-স্নান করবি। আর মা'র নাম করবি। মদ খাবি না, আর বুধবারে দাড়ি কামাবি না।'

আমি এবার হো হো করে হেসে উঠলাম। মদের নেশা তো ছিলই, তার ওপর—বুধবারে দাড়ি কামাব না! অনেকক্ষণ ধরে হাসলাম, হাসতে হাসতে বেদম হয়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, ঘরের দোর তাড়া তো বন্ধ ছিল, সন্নিসি ঢুকল কি করে? হাসি থামিয়ে চেয়ে দেখি সন্নিসি নেই, চলে গেছে। কিন্তু দোর তাড়া ঠিক আগের মতই বন্ধ আছে।

তাই বলছিলাম আমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়নি, বদলেছে এই পৃথিবীটা। যত সব অসম্ভব গাঁজাখুরি ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছে। যা ঘটতে পারে না, ঘটা উচিত নয়, তাই ঘটছে।

সে-রাত্রে এইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরের দিকে সদর দরজায় খুট্‌খুট্‌ আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম কেউ আমার সঙ্গে বজ্জাতি করছে। তখনও মদের নেশা ভাল কাটেনি, সন্নিসির কথাও মনে নেই; আমি পিস্তল নিয়ে পা টিপে টিপে গিয়ে হঠাৎ দরজা খুললাম। দেখলাম দোরের কাছে কেউ নেই, কিন্তু একটা লোক রাস্তা দিয়ে হন্‌ হন্‌ করে দূরে চলে যাচ্ছে।

আমার রোক্‌ চড়ে গেল, আমি তাকে ধরবার জন্যে বার হলাম। পায়ে জুতো নেই, হাতে পিস্তল, আমি লোকটার পেছনে চললাম। ভোরের ঘোর-ঘোর আলোয় ভাল দেখা যাচ্ছে না, আমি যত জোরে চলি, সেও তত জোরে চলে; আমি দৌড়তে লাগলাম, সেও দৌড়তে শুরু করল।

তারপর অনেকদূর দৌড়বার পর তাকে আর দেখতে পেলাম না। এতক্ষণ কোথায় যাচ্ছি তার হিসেব ছিল না, এখন চমক ভেঙে দেখি শ্মশানঘাটের কাছে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আছি।

শ্মশানঘাট তখন শূন্য। সেখানে একা দাঁড়িয়ে সন্নিসির কথা মনে পড়ে গেল। সন্নিসি বলেছিল দু'বেলা গঙ্গাস্নান করবি। তখন গরম কাল, এতখানি পথ দৌড়ে আমার সারা গায়ে ঘাম ঝরছে। ভাবলাম, মন্দ কি, স্নান করেই যাই।

গঙ্গাস্নান করে বাড়ী ফিরলাম।

সে দিনটা ছিল বুধবার, কিন্তু আমার তা মনে ছিল না। বেলা আটটার সময় দাড়ি কামাতে বসলাম। আমি নিজে দাড়ি কামাই,

নাপিতকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু ক্ষুর চালাতে গিয়ে খ্যাঁচ্ করে কেটে ফেললাম নিজের গলা। দর্দর্ করে রক্ত ঝরতে লাগল। তখন মনে পড়ল, আজ বুধবার; সন্নিসি বলেছিল বুধবারে দাড়ি কামাবি না।

দুত্তোর! দাড়ি না হয় একদিন না কামালাম। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। একটা ভিখিরি এসে আমাকে গুণ করে গেল! না, কিছুতেই না। আমি নসিং দারোগা, আমার ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়, একটা সন্নিসি আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে! দেখব কেমন সন্নিসি।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সন্ধ্যের পর একটি আস্ত ব্রাণ্ডির বোতল নিয়ে বসতে যাব, বোতলটা হাত থেকে পিছলে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। বাড়ীতে আর মদ নেই, কিন্তু আমিও হার মানব না। ঠিকে গাড়ী ভাড়া করে তখনি চললাম মদের দোকানে।

মদের দোকান বন্ধ। আর একটা দোকানে গেলাম, সেটাও বন্ধ। শুঁড়ীরা নাকি ধর্ম্মঘট করেছে।

গাড়ীতে ফিরে এসে বসতেই গাড়োয়ান প্রশ্ন করল—'হুজুর, এবার কোথায় যাব।' উত্তর দিলাম—'চুলোয়।'

গাড়ী চলল। আমি বসে বসে রাগে ফুলতে লাগলাম। তারপর গাড়ী যখন থামল, দেখলাম শ্মশানঘাটে উপস্থিত হয়েছি।

স্নান করে বাড়ী ফিরলাম।

এইরকম কয়েকদিন চলল। আমার নিজের ইচ্ছা বলে যেন কিছু নেই; আমাকে দু'বেলা গঙ্গাস্নান করতে হবে, মদ খেতে পাব না, বুধবারে দাড়ি কামাতে পাব না। আমি স্বাধীন মানুষ নয়, কেনা গোলাম; আমার অজানা মালিক আমার ঘাড় ধরে আমার মুখটা রাস্তায় ঘুরে দিচ্ছে।

একদিন উত্যক্ত হয়ে নিজের মনে বললাম, না, তোমার ওপর আমার বিশ্বাস নেই, বুজরুকি আমি মানি না। কিন্তু সন্নিসির হুকুম মানলে যদি আর গণ্ডগোল না হয় তবে তাই সই। আর মদ খাব না, দু'বেলা গঙ্গা-স্নান করব, বুধবারে দাড়ি কামাব না। এতে যদি কারুর লাভ হয় তো হোক।

দু'বেলা গঙ্গাস্নান করা ক্রমে অভ্যেস হয়ে গেল, বুধবারে দাড়ি কামানো ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মদ ছাড়া অত সহজ নয়। আরও দু'চার বার মার খেতে হল। যতবারই মদ খেতে যাই একটা না একটা বিপত্তি এসে পড়ে। একবার গেলাসে মদ ঢেলেছি ছাদ থেকে গেলাসের মধ্যে টিক্‌টিকি পড়ল। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ছেড়ে দিলাম। কিছুদিনের জন্যে মনে হল দুনিয়াটা বিস্বাদ হয়ে গেছে।

যা হোক নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কাটছে। মা'র নাম করি; মানে যখনই মনে পড়ে মা'কে বাপ তুলে গালাগালি দিই। মা কে তা জানি না, কেন আমার পেছনে লেগেছে তাও জানি না, কিন্তু চুটিয়ে মা'কে বাপান্ত করি। মা'র বোধ হয় ভাল লাগে, কারণ যতই গালাগালি দিই, আমার কোনও অনিষ্ট হয় না।

একদিন সন্ধ্যের পর খোঁড়া মানিক এল। বললে—'নর্সিংবাবু, আপনি এ শহর ছেড়ে চলে যান। রামনেহাল সিং আপনাকে খুন করবার জন্যে গুণ্ডা লাগিয়েছে। এখানে থাকলে আপনার প্রাণ যাবে।'

রামনেহাল গুণ্ডা লাগিয়েছে। আশ্চর্য নয়। আমি তার মুখে চুণকালি দিয়েছি, তার ছেলেকে জেলে পাঠিয়েছি, সে শোধ তুলতে চায়। কিন্তু আমি নর্সিং পাল, রামনেহালের ভয়ে পালিয়ে যাব? আমি চিরকাল গুণ্ডা চরিয়ে বেড়িয়েছি, আমাকে গুণ্ডার ভয় দেখাবে! কুচ পরোয়া নেই, আসুক গুণ্ডা। দেখে নেব।

তবু সাবধান হলাম। বাইরে যখন বেরুই পিস্তল নিয়ে বেরুই, রাত্রে শোবার সময় পিস্তল বালিশের পাশে থাকে। তুপুর রাত্রে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি কেউ আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা। কিন্তু কাউকে দেখতে পাই না, মনে হয় সব ধাপ্পা। আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে।

দিন আষ্টেক পরে মানিক আবার এল। একগাল হেসে বললে—'ধন্য আপনি, এত বুদ্ধিও ধরেন। রামনেহাল মুষড়ে পড়েছে।'

অবাক হয়ে বললাম—'সে কি!'

খোঁড়া মানিক বলল—'বাঘের মতন এক জোড়া কুকুর পুষেছেন আপনি, তারা সমস্ত রাত বাড়ী পাহারা দেয়। তিনবার গুণ্ডারা এসেছিল, কুকুর দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে। আমি নিজের কানে শুনেছি তারা রামনেহালকে বলছে, কুকুর নয় হুজুর, সাক্ষাৎ তুটো যমদূত।'

খোঁড়া মানিককে কিছু বললাম না, কিন্তু মনে ভারি ধোঁকা লাগল। কুকুর এল কোথেকে? তারপর সারা রাত্রি জেগে পাহারা দিয়েছি, কখনো একটা নেড়ি কুত্তাও দেখতে পাইনি।

এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। গুণ্ডারা কুকুর দেখেছে, আমি দেখতে পাইনা কেন? ভাবলাম, গুণ্ডারা আমাকে তো চেনে, আমার বাড়ীতে ঢুকতে সাহস পায়নি, নেহালকে গল্প বানিয়ে বলেছে।

তারপর বেশ কিছুদিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল। আমি অদৃশ্য কুকুরের পাহারায় নিরাপদে আছি। ভয় কেটে গেল। গঙ্গাস্নানে যাই তাও পিস্তল নিয়ে যাই না। সেই সন্নিসির আর দেখা পাইনি, মনে ধর্ম-ভাবও জাগেনি। কিন্তু নিজের মনে মা মা করি। বলি, 'মা, তুই কে? আমাকে বুঝিয়ে দে। আমার তুনিয়া ওলট-পালট হয়ে গেছে, কিছু বুঝতে পারছি না। তুই বুঝিয়ে দে।'

মা বুঝিয়ে দেয় না। সর্বনাশী আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা দেখে।

ছ'মাস আগের কথা বলছি। খোঁড়া মানিক এল; তার মুখ শুকনো। বললে—'আপনি নাকি সকাল সন্ধ্যে শ্মশানঘাটে নাইতে যান ?'

বললাম—'হ্যাঁ যাই।'

খোঁড়া মানিক বললে—'ওরা জানতে পেরেছে।—হিন্দু গুণ্ডারা আপনাকে মারতে রাজি হয়নি, বলেছে আপনি নাকি কাপালিক, শ্মশানে শবসাধনা করেন। তাই রামনেতাল মুসলমান গুণ্ডা লাগিয়েছে। নাম জানেন বোধ হয়, রহিম আর করিম দুই ভাই। তারা শ্মশানের রাস্তায় আপনাকে ছুরি মারবে।'

খোঁড়া মানিক চলে যাবার পর ভাবতে বসলাম। কি করা যায়! গঙ্গাস্নান বন্ধ করা যাবে না, কারণ জানি নিজের ইচ্ছায় না গেলে ঘাড় ধরে নিয়ে যাবে। এক, পিস্তল নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু কেন জানি না, পিস্তল নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতে আর ইচ্ছে হল না। দূর হোক গে, যা হবার হবে। আমার ইচ্ছেয় তো কিছুই হচ্ছে না, তবে মিছে ভেবে মরি কেন ?

দুচার দিন কিছু হল না। স্নান করতে যাই, ফিরে আসি। আমার পেছনে গুণ্ডা লেগেছে তা প্রায় ভুলেই গেলাম। তারপর একদিন—

সন্ধ্যের পর শ্মশানের দিকটা কি রকম নির্জন হয়ে যায় দেখেছেন তো। ওদিকে ঘর-বাড়ীও নেই, লোক চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আমি স্নান করে ফিরছি; রাত আন্দাজ আটটা। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। হঠাৎ পিছনে একটা বিকট চীৎকার শুনে আঁৎকে উঠলাম। মানুষের গলার মর্মান্তিক চীৎকার, সেই সঙ্গে কুকুরের গভীর ডাক। যেন একটা

ডালকুত্তা একটা মানুষের গলা কামড়ে ধরে তার চীৎকার বন্ধ করে দিলে।

আমি আর দাঁড়ালাম না, টেনে ছুট মারলাম।

পরদিন সকালবেলা খবর পাওয়া গেল, শ্মশানঘাটের রাস্তায় রহিম গুণ্ডার লাস পাওয়া গেছে। তাকে শ্মশানের কুকুর নাকি টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলেছে। রহিমের হাতে একটি বর্শা ছিল, তবু সে আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

রাত্তিরে খোঁড়া মানিক এল। রহিমের ভাই করিম রামনেহালকে যা বলেছে, তার কাছে শুনলাম। ওরা দু'ভাই ক'দিন ধরে আমার জন্যে ওৎ পেতে ছিল, রোজই দেখত এক জোড়া কালো কুকুর আমার পেছনে থাকে। কাল রহিম আর করিম রাস্তার ধারের একটা গাছে উঠে বসে ছিল, মতলব করেছিল যেই আমি গাছতলা দিয়ে যাব অমনি বর্শা ছুঁড়ে আমায় মারবে; কুকুর তাদের কিছু করতে পারবে না। কিন্তু বর্শা ছুঁড়তে গিয়ে রহিম নিজেই পা ফস্‌কে নীচে পড়ে গেল, আর একটা কুকুর এসে ধরল তার টুঁটি—

এই পর্যন্ত বলিয়া নৃসিংহবাবু নীরব হইলেন। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিলেন—'এই আমার গল্প। রামনেহাল আর আমাকে ঘাটায় নি। সেই থেকে নির্ভয়ে আছি।

'এখন আপনি বলুন—এ সব কী? অলৌকিক বললে চলবে না, কেন অলৌকিক তা বলতে হবে। সন্নিসি বলেছিল, আমার সময় হয়েছে। কিন্তু কি করে সময় হল? শুনেছি যাঁরা সাধুসজ্জন যোগী তপস্বী, ভগবান তাঁদের দয়া করেন, বিপদে রক্ষে করেন। কিন্তু এ কি! জীবনে আমি একটা ভাল কাজ করিনি, মন্দ কাজ এত করেছি যে তার সীমাসংখ্যা হয় না; তবে বেছে বেছে আমাকে দয়া করবার মানে কি? জোর করে

আমাকে মদ ছাড়ানো, গঙ্গাস্নান করানো, আমাকে শত্রুর প্রতিহিংসা থেকে আগ্‌লে রাখা, এসব কেন? আপনি বিদ্বান লোক, এর উত্তর দিন। কেন? কেন? কেন?’

নৃসিংহবাবু কদাকার মুখে তীব্র জিজ্ঞাসা ভরিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, হয়তো তাঁহার এই তীব্র ব্যাকুল জিজ্ঞাসাই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর।

অষ্টমে মঙ্গল

আমি যখন বিহারে বাস করিতাম, তখন আমার এক বন্ধু ছিল বৈজনাথ প্রসাদ। সে শহর হইতে ত্রিশ মাইল দূরে একটি বড় গ্রামে ডাক্তারি করিত। স্কুলে বৈজনাথের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়িয়াছিলাম, তারপর বড় হইয়া আমি যখন উকিল হইলাম এবং সে ডাক্তার হইয়া নিজের গ্রামের গিয়া বসিল, তখনও বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল। সদরে কাজ পড়িলে সে আমার বাড়িতে আসিয়া উঠিত এবং শীতকালে যখন আমার শিকারের বাতিক চাগাড় দিত, তখন আমি তাহার গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতাম।

বৈজনাথ ডাক্তার ছিল বটে, কিন্তু ডাক্তারি তাহার পেশা ছিল না। গ্রামে তাহার বিস্তর জমি-জমা ছিল; তাহাই দেখাশুনা করিত এবং অবসরমত অবৈতনিকভাবে গ্রামবাসীদের ঔষধ দিত। তাহার ডাক্তারখানার চালাঘরটি প্রকৃতপক্ষে ইয়ার-বন্ধুদের আড্ডাঘর ছিল।

সেবার হেমন্তের শেষে বৈজনাথের গ্রামে গিয়াছি। বৈজনাথ জাতিতে কায়স্থ, সুতরাং ঘোর মাংসাশী; আমি যাইতেই একটা খাসী কাটিয়া ফেলিল। তারপর রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া, একটু-আধটু বিলাতী মদ্য—চিরদিনের কর্মসূচীর ব্যতিক্রম হইল না।

সে-রাত্রে এগারোটার সময় চন্দ্রোদয়, পাঁজিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। চাঁদ উঠিলে ধানের ক্ষেতে হরিণ শূকর শস্য খাইতে আসে, তখনই তাহাদের বধ করিবার উপযুক্ত সময়। এই বধকার্য অমেধ্য নয়। আমাদের রোপিত শস্য খাইয়া তাহারা মোটা হয়, আমরা তাহাদের খাইয়া মোটা হই, এইভাবে প্রবর্তিত চক্র ঘুরিতে থাকে। এই প্রবর্তিত চক্র যে অনুবর্তন না করে, হে পার্থ, সে বৃথাই জন্মিয়াছে।

আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল; অতঃপর আমরা বন্দুক ঘাড়ে বাহির হইলাম।

কিন্তু এটা শিকারের গল্প নয়, মংলু মুশহরের করুণ কাহিনী। শিকারের কথা লিখিবার লোভ হইলেও লোভ সংবরণ করিতে হইতেছে। চাঁদের আলোয় যখন দূরপ্রসারী শস্যশীর্ষ কাঁপিতে থাকে এবং নিকটস্থ বনের ছায়াতল হইতে হরিণের দল সারি দিয়া বাহির হইয়া আসে, সে দৃশ্য ভুলিবার নয়। কিন্তু থাক।

শিকার মন্দ হইল না, দুটা হরিণ, একটা শূকর, একটা সজারু। শেষ রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া হৃষ্টমনে শয্যা আশ্রয় করিলাম। বৈজনাথের ডাক্তারখানার একটা ঘরে চারপাই পাতিয়া আমার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ঘুম ভাঙিল অনেক বেলায়। ডাক্তারখানার সম্মুখে মনুষ্য কণ্ঠের কলরব, অনেক রোগী জড়ো হইয়াছে। আমি উঠিয়া গিয়া বাহিরের বারান্দায় তক্তাপোষে বসিলাম। চাকর গুড়ের চা ও কদ্দুর মোরব্বা দিয়া গেল, তাহা সেবন করিতে করিতে সিগারেট ধরাইলাম।

বৈজনাথের ডাক্তারি দেখিতেছি। চির পরিচিত দৃশ্য। রুগী বা রুগীর আত্মীয় শিশি-হাতে বারান্দার নীচে বসিয়াছে। স্ত্রীলোক আছে, পুরুষ আছে, বালক-বালিকা আছে। বৈজনাথ একে একে তাহাদের ডাকিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে। কাহারও দম্‌মা, কাহারও পিল্‌হী, কাহারও বোখার। বৈজু হাই তুলিতে তুলিতে তাহাদের গালিগালাজ করিতেছে এবং ঔষধ দিতেছে।

ক্রমে রুগীর দল ঔষধ লইয়া বিদায় হইল, অঙ্গন শূন্য হইয়া গেল। বৈজনাথ আমার পাশে বসিয়া চায়ের বাটি তুলিয়া লইল।

এই সময় লক্ষ্য করিলাম, সম্মুখের বিস্তৃত মাঠের অন্য প্রান্ত হইতে

একটা লোক আসিতেছে। লোকটার প্রকাণ্ড কালো দেহ, পিঠে কি-একটা গুরুভার বস্তু বহন করিয়া আসিতেছে।

বৈজনাথকে প্রশ্ন করিলাম—'ওটা কে? এদিকেই আসছে মনে হচ্ছে।'

বৈজনাথ একবার চোখ তুলিয়া বলিল—'মংলু মুশহর বৌ নিয়ে আসছে।'

'বৌ কোথায়?'

'ওই যে ওর পিঠে। মুশহরদের গ্রাম এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে। বৌ হেঁটে আসতে পারে না, তাই তাকে পিঠে করে আনে।'

'রোজ আনে?'

'রোজ নয়, হপ্তায় দু-তিন দিন।'

'রোগটা কি?'

'জটিল স্ত্রীরোগ। বছর দুই ধরে ভুগছে, বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছে। তবে মুশহরদের কঠিন প্রাণ, সহজে মরে না।'

মুশহর জাতি বিহারের অন্ত্যজ পর্যায়ের জাতি। ইহারা ইঁদুর খায়, শূয়োর খায়; অসাধারণ কায়িক পরিশ্রম করিতে পারে। বিহারে যত পাকা সড়ক আছে, সমস্তই এই মুশহরদের তৈরি। ইহারাই পাথর ভাঙে, ইহারাই পথ গড়ে। খর রৌদ্রে সারাদিন কাজ করার ফলে ইহারা অধিকাংশই রাতকানা। দিনের কাজের শেষে এক বোতল ধেনো মদ এবং একটি সঙ্গিনী—ইহাই তাহাদের কাম্য, আর কিছু চায় না।

মংলু মুশহর আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বৈজনাথের পানে চাহিয়া সসম্ভ্রমে হাসিল। তাহার পিঠে ময়লা কাপড়ে ঢাকা বৌটা চামচিকার মত আঁকড়াইয়া ছিল; মংলুর গলায় রূপার বালা-পরা দুটা হাত এবং কোমরে রূপার কড়া-পরা দুটা পা ছাড়া আর কিছুই দেখা

যাইতেছিল না। মংলু অতি যত্নে বৌকে পিঠ হইতে নামাইয়া মাটিতে বসাইল। নোংরা কাপড়ের আড়ালে বৌয়ের মুখ দেখিতে পাইলাম না।

কিন্তু মংলুর দিক হইতে চোখ ফেরানো যায় না। বয়স পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে, পাথর-কোঁদা চেহারা। ছ' ফুট লম্বা, মুখশ্রী আদিম মানুষের মত কুৎসিত নয়, হাসিটি বড় মিষ্টি। কোমর হইতে জানু পর্যন্ত কাপড় দিয়া ঢাকা, বাকি অঙ্গ উন্মুক্ত। প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর হাতের কাছে কষ্টিপাথর পাইলে বোধ করি এমনি একটি মূর্তি গড়িতে পারিতেন।

বৈজনাথ বলিল—'কিরে মংলু, বৌয়ের খবর কি?'

মংলু হাসিমুখেই বলিল—'আর বলবেন না সরকার, বৌয়ের জন্য মরে গেলাম। কাজকম শিকেয় উঠেছে, রোজগার বন্ধ। মরেও না নিগোড়ি, ম'লে আমি ছুটি পাই। সরকার একটা উপায় করুন।'

'কি উপায় করব? বিষ খাইয়ে মেরে ফেলব?'

মংলুর মুখের হাসিটি করুণ হইয়া গেল—'তাই কি বলেছি হুজুর? ওকে ভাল করে দিন।'

'ভাল করা ভগবানের হাত। ভেতরে নিয়ে আয়, দেখি।'

মংলু কাপড়ের পুঁটুলি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া ভিতরে গেল।

পনেরো মিনিট পরে বৌকে পিঠে লইয়া মংলু আবার বাহির হইল।

বৈজনাথ বলিল—'ওষুধটা নিয়ম করে খাওয়াস্। আর শোন্, কাল রাত্রে শুয়োর মেরেছি, সেটা তুই নিয়ে যা। তোরা নিজেরা খাস্ আর গাঁয়ের লোককে বিলোস্।'

শুয়োর দেখিয়া মংলু একগাল হাসিল—'কাউকে বিলোতে পারব না হুজুর, আমরা নিজেরাই খাব। আমার এখন রোজগার নেই।'

পিঠে বৌ এবং হাতে আধ মণ ওজনের শূয়োরটাকে ঝুলাইয়া মংলু অবলীলাক্রমে চলিয়া গেল।

মংলু অন্তর্হিত হইলে বৈজনাথ বলিল—'মংলু বৌটাকে ভালবাসে। মুশহরদের মধ্যে একনিষ্ঠার বালাই নেই, মংলুটা কেমন ছটকে বেরিয়ে গেছে। বৌ নিয়েই আছে। ছোটলোকদের মধ্যে এমন দেখা যায় না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাঁচবে বৌটা?'

বৈজনাথ হাত উল্টাইয়া বলিল—'কিছুই বলা যায় না। হয়তো এমনি ভুগে ভুগেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে। মংলুর জন্যে দুঃখ হয়।'

সে যাত্রা আরও দুদিন থাকিয়া আরও অনেকগুলো হরিণ-শূয়োর মারিয়া ফিরিয়া আসিলাম। তারপর কয়েক বছর নানা পাকচক্রে বৈজুর গ্রামে আর যাইতে পারি নাই। কিন্তু যখনই মুশহরদের গাঁইতি হাতে রাস্তায় কাজ করিতে দেখিয়াছি, তখনই মংলুকে মনে পড়িয়াছে। মংলুর বৌটা এখনও বাঁচিয়া আছে কি না, কে জানে। হয়তো টিকিয়া আছে, মংলু এখনও তাহাকে পিঠে করিয়া ডাক্তার দেখাইতে আসিতেছে। বৈজু বলিয়াছিল, ছোটলোকদের মধ্যে এমন দেখা যায় না। ভদ্রলোকদের মধ্যেও আজ পর্যন্ত কাহাকেও স্ত্রীকে পিঠে করিয়া ডাক্তারের কাছে যাইতে দেখি নাই।

চার বছর পরে আবার একদিন বৈজুর গ্রামে উপস্থিত হইলাম। তেমনি খাসি কাটা রান্নাবান্না পানভোজন চলিল। চাঁদনী রাত ছিল, মধ্য রাত্রে দুজনে শিকারে গেলাম।

পরদিন সকালে ডাক্তারখানার সামনে তেমনি রুগীর ভিড়। দম্‌মা পিল্‌হী, বুখার। বৈজু রুগীদের পরীক্ষা করিতেছে, গ্রাম্য ভাষায় গালাগালি দিতেছে, ঔষধ বিতরণ করিতেছে। মাঝে চার বছর কাটিয়া গিয়াছে বোঝা যায় না।

এক সময় চোখ তুলিয়া দেখি, চার বছরের পুরানো চিত্রটি সব দিক দিয়া পূর্ণাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। মাঠ ভাঙ্গিয়া মংলু আসিতেছে। পিঠে ময়লা কাপড়-ঢাকা বৌটা চামচিকার মত আঁকড়াইয়া আছে।

রুগীরা তখনও সব বিদায় হয় নাই। মংলু বৌকে সযত্নে নামাইয়া পাশে বসাইল। এই কয় বছরে মংলুর চেহারার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই; তেমনি নিরেট নিটোল কষ্টিপাথরের মূর্তি, মুখে তেমনি মিষ্ট হাসি।

বৌটা এখনও বাঁচিয়া আছে।

বৈজনাথের পুত্র বানারসী ওরেফ বন্নু আসিয়া বলিল—'চাচা, দাদি তোমাকে ডাকছেন, হাত দেখাবেন।'

বন্নুর অনুসরণ করিয়া হাবেলিতে গেলাম। বৈজনাথের মা আমাকে স্নেহ করেন, কি করিয়া খবর পাইয়াছেন আমি হাত দেখিতে জানি। প্রত্যেক বারই তাঁহার করকোষ্ঠি দেখিতে হয়।

আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি রুগীরা প্রস্থান করিয়াছে, মংলুও বৌকে পিঠে ঝুলাইয়া মাঠের উপর দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতেছে।

বৈজু তক্তপোশে বসিয়া গড়গড়া টানিতেছিল, আমার হাতে নল দিয়া বিমনাভাবে বলিল—'গ্রামের জীবনে ওঠা-নামা নেই, আজও যেমন, কালও তেমনি। সেই একই মানুষ, একই ব্যারাম, একই জীবনযাত্রা। তুমি চার বছর আগে যা দেখেছিলে, আজও তাই দেখছ, আবার দশ বছর পরে যখন আসবে তখনও তাই দেখবে।'

মংলুর মূর্তি তখন দূরে মিলাইয়া যাইতেছে। আমি বললাম—'হয়তো মংলুর বৌটা তখনও বেঁচে থাকবে।'

বৈজু চকিতে আমার পানে চাহিল, তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—'হাসলে যে!'

বৈজু বলিল—'তুমি চার বছর আগে যাকে দেখেছিলে, এ সে বৌ

নয়। সে বৌটা সেই শীতেই মারা গেছে। তারপর আবার মংলু বিয়ে করেছে ; কিন্তু এমন ব্যাটার কপাল, এবারও ঠিক তাই। এখন এটা কদ্দিন টে'কে দেখ।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ বৌকে মংলু ভালবাসে ?'

বৈজু বলিল—'ঠিক আগের মতই। বিয়ের পর মাস ছয়েক বৌটা ভাল ছিল, তারপর রোগে ধরেছে। মংলুর দাম্পত্য-জীবনে সুখ নেই। হয়তো গ্রহ-নক্ষত্রের দোষ আছে। তোমার জ্যোতিষ শাস্ত্রে কি বলে ?'

বলিলাম—'হয়তো মংলুর অষ্টমে মঙ্গল।'

ভূত-ভবিষ্যৎ

গভীর রাত্রে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া উপন্যাসখানা লিখিতেছিলাম। টেবিলের এক কোণে মোমবাতিটা গলদশ্রু হইয়া জ্বলিতেছিল। হঠাৎ চোখ তুলিয়া দেখি প্রেত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কলম রাখিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলাম—'আমি পারব না।'

প্রেত কাতর চক্ষে আমার পানে চাহিয়া রহিল; মিনতিভরা স্বরে বলিল—'আপনি দয়া না করলে আমার আর উপায় নেই। মেয়েটা নষ্ট হয়ে যাবে। পাড়ার ছোঁড়াগুলো তার পেছনে লেগেছে।'

প্রেতের কণ্ঠস্বর খষা-খষা; গ্রামোফোন রেকর্ডে গান সুরু হইবার আগে যেরূপ শব্দ হয় অনেকটা সেইরকম। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—'তা আমি কি করব? আপনি অন্য কারুর কাছে যান না।'

প্রেত বলিল—'আর কার কাছে যাব? সবাই চোর। আপনি দয়া করুন।'

ভূতের কথায় মনটা একটু নরম হইল। সত্য বটে আমি দেনার দায়ে লুকাইয়া আছি, কিন্তু তবু চুরি যে করিব না—এ বিশ্বাস ভূতেরও আছে। বলিলাম—'আচ্ছা, আপনি ঐ মেয়েটাকে কিম্বা তার বাপকে আপনার কথা বললেই পারেন, তারা নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে। আমাকে কেন?'

প্রেত একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিল; মোমবাতির শিখা একটু নড়িয়া উঠিল। সে বলিল—'চেষ্টা কি করিনি? আমাকে দেখেই ভয়ে

হাউমাউ ক'রে উঠল। তারপর বাড়িতে রোজা ডেকে ঝাড়িয়েছে। ওদিকে আমার আর যাবার উপায় নেই।'

রাত্রি প্রায় বারোটা। আমি ফুৎকারে বাতি নিভাইয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। প্রেত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তক্তপোশের পাশে বসিল, করুণস্বরে বলিল—'দয়া করুন। আপনার কল্যাণ হবে।'

বড় বিপদে পড়িয়াছি।

আমি একজন সাহিত্যিক। বাজারে নাম হইয়াছে; কিন্তু নাম হইলেই সাহিত্য-বাজারে টাকা হয় না। ফলে, একদিন যাঁহারা বন্ধু ছিলেন তাঁহারা মহাজন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; আমাকে দেখিলেই মুখ ভার করেন, কিম্বা তাগাদা করেন।

বন্ধুত্বের দাক্ষিণ্য যখন একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল তখন স্থির করিলাম কলিকাতা হইতে অন্তত কিছু দিনের জন্য গা ঢাকা দিব। ভাগ্যক্রমে একজন প্রকাশক একটি উপন্যাস লেখার বরাত দিলেন; কিছু দাদনও আদায় করিলাম। সেই দাদনের টাকা লইয়া কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িয়াছি এবং পশ্চিমবঙ্গের একটি শহরে জীর্ণ খোলার ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছি। উপন্যাস শেষ না হইলে ফিরিব না।

আমার খোলার ঘরের জানালা ভাঙা, খাপ্‌রার ছাউনীও নিরবচ্ছিন্ন নয়। আসবাবের মধ্যে কীটদষ্ট তক্তপোশ, নড়বড়ে টেবিল ও একটি টুল। যিনি ঘরটি ভাড়া দিয়াছেন তিনি পাশেই পাঁচিল-ঘেরা মস্ত বাড়িতে থাকেন, মহাজনী কারবার আছে। এ জগতে মহাজনী কারবার কিম্বা পুস্তক-প্রকাশকের ব্যবসা না করিতে পারিলে বাঁচিয়া সুখ নাই। মহাজন নিকুঞ্জবাবুর চোখ দুটি বড় সন্দিগ্ধ; এক মাসের ভাড়া আগাম

লইয়া থাকিতে দিয়াছেন। অল্প দূরে একটি সস্তা ভোজনালয় আছে, সেইখানেই আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছি।

প্রথম তিনদিন বেশ নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। উপন্যাস সুরু করিয়া দিয়াছি; খোলার ঘরে যে উপদেবতার যাতায়াত আছে তাহা জানিতে পারি নাই। চতুর্থ দিন রাত্রে আলো নিভাইয়া শয়ন করিলাম। আমার অভ্যাস, বিছানায় শুইয়া একটি বিড়ি সেবন না করিলে নিদ্রা আসে না। দেশলাই জ্বালিতেই চোখে পড়িল কে একজন তক্তপোশের পাশে বসিয়া আমার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। দু'টা আগ্রহ-ভরা চোখ—

চমকিয়া বলিয়া উঠিলাম—'কে?'

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটা মিলাইয়া গেল।

আবার দেশলাই জ্বালিলাম। কেহ নাই। ভাবিলাম ভুল দেখিয়াছি। অনেকক্ষণ ধরিয়া লিখিলে এমন হয়। চোখের ভ্রান্তি।

বিড়ি পান করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার স্নায়ু দুর্বল নয়; ভূতের ভয় করি না। ভূত থাকে থাক্, তাহাকে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই; ভূতের চেয়ে মানুষকেই ভয় বেশি।

পরদিন সকালে রাত্রির কথা আর মনেই রহিল না। সারাদিন উপন্যাস লিখিলাম। উপন্যাসে প্রেমের প্রগতি দেখাইতেছি। আমার হিরো একেবারে নিম্নতম স্তর হইতে আরম্ভ করিয়াছে; এক মেথর-কন্যার প্রতি অবৈধভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে পৈশাচ বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। (পৈশাচ বিবাহের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে অভিধান দেখুন)। কাহিনী বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

তারপর রাত্রে যথারীতি তক্তপোশে শয়ন করিয়া বিড়ি সেবনপূর্বক ঘুমাইবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু ঘুমাইতে হইল না; হঠাৎ চট্‌কা ভাঙিয়া শুনিলাম, ঘষা-ঘষা গলায় কে বলিতেছে—'ঘুমোলেন নাকি?'

অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না, কিন্তু মনে হইল যিনি প্রশ্ন করিলেন তিনি তক্তপোশের পাশে বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম—'আপনি কে?'

উত্তর হইল—'কি বলে পরিচয় দেই? যখন বেঁচে ছিলাম তখন নাম ছিল নন্দদুলাল নন্দী।'

বলিলাম—'খাসা নাম। আপনি তাহলে প্রেত?'

প্রেত বলিল—'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না। আমার কোনও বদ্ মতলব নেই।'

আমি একটা হাই তুলিয়া বলিলাম—'বদ্ মতলব থাকলেও আপনি আমার কোনও অনিষ্ট করতে পারবেন না—আপনি তো হাওয়া। তবে আমি ভয় পেয়ে নিজে নিজের অনিষ্ট করতে পারি বটে।'

প্রেত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'তা বটে।'

মনে পড়িল দেশলায়ের বাক্সটা মাথার শিয়রেই আছে। সেই দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলাম—'আমার সঙ্গে কিছু দরকার আছে কি?'

প্রেত বলিল—'দরকার এমন কিছু নয়। কথা কইবার লোক পাই না—আপনি স্বজাতি—তাই—'

দেখিলাম প্রেতের অবস্থা আমারই মতন; সম্ভবত বন্ধুদের নিকট টাকা ধার লইয়াছে। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া দেশলাই জ্বালিতে উদ্যত হইয়াছি, সে বলিল—'দেশলাই জ্বালবেন?'

'কেন, আপনার আপত্তি আছে?'

'হঠাৎ আলো জ্বাল্‌লে একটু অসুবিধে হয়।'

'তবে থাক্। কাল আপনার চেহারাটা লহমার জন্যে দেখেছিলাম, ভাল ঠাহর করতে পারিনি। তা থাক্।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ভাবিলাম, বেচারা কথা কহিবার লোক পায়

না, স্বজাতি পাইয়া আলাপ করিতে আসিয়াছে, আমার কিছু বলা-কহা দরকার।

'আপনি কি কাছে পিঠে কোথাও থাকেন?'

'পাশে পাঁচিল-ঘেরা বাগানে পুরোনো নিমগাছ আছে, তাতেই থাকি।'

'তাই নাকি? আপনিও নিকুঞ্জবাবুর ভাড়াটে? কত ভাড়া দিতে হয়?'

প্রেত রসিকতা বুঝিল না, বলিল—'বাড়ি বাগান একদিন আমারই ছিল। আমার প্রপৌত্রের কাছে নিকুঞ্জ পাল কিনেছে।'

'বটে! আপনার প্রপৌত্র বেঁচে আছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। তার অবস্থা বড় খারাপ হয়ে গেছে—'

'প্রপৌত্র! তাহলে আপনি আন্দাজ আশী-নব্বই বছর আগে ছিলেন?'

'সিপাহী যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম। মুচ্ছুদ্দির কাজে পয়সা করেছিলাম; ভেবেছিলাম সাতপুরুষ ব'সে খাবে—কিন্তু—'

প্রেতের কথা শেষ হইল না। আমি অভ্যাসবশত অন্যমনস্কভাবে একটি বিড়ি মুখে দিয়া ফস্ করিয়া দেশলাই জ্বালিলাম। প্রেতের ত্রস্ত-চকিত চেহারাখানা ক্ষণেকের জন্য দেখা গেল; তারপর সে হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।

আবার হয়ত আসিবে ভাবিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া বিড়ি টানিলাম। কিন্তু প্রেত আর আসিল না। তারপর কয়েক রাত্রি তাহার দেখা পাই নাই।

এদিকে আমার উপন্যাস দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। হিরো এখন এক রজক-কন্যার কৌমার্যহানির উদ্যোগ করিতেছে। এর পর

আসিবে গোপ-কন্যা। স্থির করিয়াছি, এইভাবে ধাপে ধাপে তুলিয়া হিরোকে এক চিত্রাভিনেত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া ছাড়িব। উপন্যাসের নাম রাখিয়াছি—স্বর্গের সিঁড়ি।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর বাতি জ্বালিয়া লিখিতে বসিয়াছিলাম। খুব মন লাগিয়া গিয়াছিল, সময়ের হিসাব ছিল না। মনোজগতে নিরঙ্কুশ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ পা পিছলাইয়া স্থূল জগতে ফিরিয়া আসিলাম। দেখি, টেবিলের অপর পারে দাঁড়াইয়া প্রেত মিটিমিটি হাসিতেছে।

আজ প্রেতকে প্রথম ভাল করিয়া দেখিলাম। সূক্ষ্ম মূর্তি; তবু চেহারার মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু নাই। গায়ে ফিতা-বাঁধা মেরজাই, মেটে-মেটে রং, সরু পাকানো গোঁফ; চোখদুটি সজাগ ও প্রাণবন্ত। বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন। নিতান্তই সেকালের বাঙালী চেহারা।

প্রেত বলিল—'কি লেখেন এত?'

বলিলাম—'উপন্যাস।'

'সে কাকে বলে? আমাদের সময় তো ছিল না।'

উপন্যাস কী তাহা বুঝাইয়া দিলে প্রেত সাগ্রহে বলিল—'ও—গোলে বকাওলির গল্প—রূপকথা! তা বলুন না শুনি।'

সংক্ষেপে গল্পটা বলিলাম। শুনিয়া ভূত বলিল—'ছি ছি।'

বলিলাম—'ছি ছি বললে চলবে কেন, এ না হলে বই কাটে না। যাহোক ক'দিন আসেননি যে?'

প্রেত বলিল—'আপনি অদ্ভুত লোক। অন্য লোক ভূত দেখলে আঁৎকে ওঠে, আপনি গ্রাহ্যই করেন না।'

বলিলাম—'সে-রাত্রে আচম্‌কা দেশলাই জ্বেলেছিলাম তাই রাগ হয়েছিল বুঝি?'

'রাগ নয়—চম্‌কে গিয়েছিলাম। চম্‌কে গেলে আর শরীর ধারণ করা যায় না।'

খাতা টানিয়া লইয়া বলিলাম—'আচ্ছা, আজ আপনি আসুন, পরিচ্ছেদটা শেষ করতে হবে। মাঝে মাঝে আসবেন, গল্প-সল্প করা যাবে।'

'আচ্ছা।'—প্রেত চলিয়া গেল।

তারপর প্রেত প্রায় প্রতি রাত্রেই আসে; কিছুক্ষণ গল্পগুজব হয়, তারপর 'আসুন' বলিলেই হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। এ আমার শাপে বর হইয়াছে। এখানে আসিয়া মানুষ প্রতিবেশীর সহিত ইচ্ছা করিয়াই আলাপ পরিচয় করি নাই; তৎপরিবর্তে যাহা পাইয়াছি তাহা মোটেই অবাঞ্ছনীয় নয়। প্রেতের সঙ্গে যতটুকু ইচ্ছা মেলামেশা করি, সঙ্গ-পিপাসা মিটিলেই তাহাকে চলিয়া যাইতে বলি, সে চলিয়া যায়। মানুষ প্রতিবেশীকে এত সহজে তাড়ানো যাইত না। 'ঘণ্টা ধ'রে থাকেন তিনি সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায়।'

আমার ভূতই ভাল।

একদিন ভূত জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা, আপনি সংসার করেছেন?'

বলিলাম—'সংসার? মানে বিয়ে? সর্বনাশ, একলা শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। ও কাজটি আমাকে দিয়ে হবে না।'

ভূত একটু হাসিল। কিছুক্ষণ যেন অন্যমনস্ক থাকিয়া হঠাৎ বলিল—'দেখুন আপনার সঙ্গে এ ক'দিন মেলামেশা করে বুঝেছি আপনি সজ্জন—চোর-ছ্যাচড় নয়। আমি অনেকদিন থেকে আপনার মতন একজন মানুষ খুঁজছি। আমার একটি অনুরোধ আছে, আপনাকে রাখতে হবে।'

ভূত যে নিছক আমার সঙ্গ-লাভের জন্য নয়, একটা মৎলব লইয়া আমার কাছে ঘোরা-ঘুরি করিতেছে তাহা এতদিন বুঝিতে পারি নাই।

বোঝা উচিত ছিল, মুচ্ছুদ্দির প্রেতাত্মা বিনা প্রয়োজনে কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবে মনে করাও অন্যায়।

সতর্ক ভাবে বলিলাম—'কি অনুরোধ ?'

ভূত তখন টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া নিজের ও বংশের ইতিকথা বলিতে আরম্ভ করিল। আন্দাজ করিলাম কাঁকড়াবিছার ল্যাজে যেমন হুল থাকে, অনুরোধটা আছে গল্পের শেষে।

নন্দদুলাল নন্দী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা করিয়া প্রচুর উপার্জন করিয়াছিল। জমিদারী বাগান শ্বেতবালাখানা সবই হইয়াছিল। তাহার যখন তিপ্পান্ন বছর বয়স তখন সিপাহী-বিদ্রোহের গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। এদিকে যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না, কিন্তু যাহার টাকা আছে তাহার আশঙ্কার শেষ কোথায়? একদা গভীর রাত্রিকালে নন্দদুলাল একটি পিতলের ঘটিতে একশত মোহর পুরিয়া বাগানের নিমগাছ-তলায় পুঁতিয়া রাখিল। আর সবই যদি যায়, একশত আকবরী মোহর তো বাঁচিবে।

ম্যুটিনীর হাঙ্গামা এদিকে আসিল না বটে, কিন্তু অরাজকতার সময়, হঠাৎ একদিন নন্দদুলালের বাড়িতে ডাকাত পড়িল। নন্দদুলালের হৃৎযন্ত্র দুর্বল ছিল, সে বেবাক হার্টফেল করিয়া মারা গেল। ডাকাতেরা লুটপাট করিয়া চলিয়া গেল। তারপর ক্রমে দেশ ঠাণ্ডা হইল; শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল।

নন্দদুলাল হিসাবী লোক ছিল। তাই তাহার আমলে 'চাল' বেশি বাড়িতে পায় নাই। তাহার পুত্র যশোদাদুলালের আমলে বাবুয়ানি বাড়িল; আগে দোল-দুর্গোৎসবের সময় হরিকীর্ত্তন কথকতা হইত, এখন বাঈ নাচ দেখা দিল। তারপর তস্য পুত্র ব্রজদুলাল আসিয়া বিলাসিতার চরম করিয়া ছাড়িয়া দিল; জুতায় মুক্তার ঝালর লাগাইয়া, বাঈজীর

পল্টন পুষিয়া, একশ' টাকার নোটের ঘুড়ি উড়াইয়া সে যখন পৃথিবী হইতে বিদায় লইল তখন লক্ষ্মীও বিদায় লইয়াছেন। বাকি আছে শুধু বাগান-ঘেরা বাড়িখানা।

ব্রজদুলালের পুত্র গোপীদুলাল নিরীহ মানুষ। বাপের ভুক্তাবশিষ্ট এঁটো পাতায় যত দিন পারিল চালাইল; শেষ পর্যন্ত তাহাকে বাড়ি বিক্রয় করিতে হইল। তারপর গত বিশ বছর ধরিয়া গোপীদুলাল বাড়ির বিক্রয়মূল্য লইয়া এবং সামান্য কাজকর্ম করিয়া অতি দীন ভাবে সংসার চালাইতেছে। তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে; একমাত্র কন্যার বয়স একুশ, কিন্তু এখনও তাহার বিবাহ দিতে পারে নাই। উপরন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ তাহাকে দুরন্ত হাঁপানী রোগে ধরিয়াছে।

কাহিনী শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনার প্রপৌত্র মানে গোপীদুলালবাবু এখানেই থাকেন?'

প্রেত বলিল—'হ্যাঁ, বেনে পাড়ার এক ধারে একটা ভাঙা বাড়িতে পড়ে আছে। তারও বেশি দিন নয়, তাকে কালে ধরেছে। আর তো কিছু নয়, গোপীদুলাল ম'লে মেয়েটা ভেসে যাবে।' বলিয়া করুণ নিশ্বাস ফেলিল।

সন্দেহ হইল প্রেত বুঝি ঘট্‌কালি করিতেছে। মনকে দৃঢ় করিয়া বলিলাম—'দেখুন আমি আগেই বলেছি বিয়ে করবার মত অবস্থা আমার নয়। আপনি ও অনুরোধ করবেন না।'

প্রেত তাড়াতাড়ি বলিল—'না না, ও অনুরোধ করছি না; আমি বলছিলাম, আপনি যদি দয়া ক'রে মোহরগুলো গোপীদুলালের কাছে পৌঁছে দেন তাহলে সে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে মরতে পারে।'

অবাক হইয়া বলিলাম—'মোহরের ঘটি কি এখনও নিমতলায় পোঁতা আছে নাকি?'

প্রেত বলিল—'হ্যাঁ। মরার আগে কাউকে ব'লে যেতে পারলাম না; যেমন পুতেছিলাম তেমনি পোতা আছে। তাই তো নিমগাছ ছাড়তে পারি না।'

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। আশ্চর্য এই যে ভূতের কথায় তিলমাত্র অবিশ্বাস জন্মিল না। একশত আকব্বরী মোহর! আকব্বরী মোহরের দাম কত জানি না কিন্তু বর্তমান কালে একশত মোহরের দাম দশ হাজার টাকার কম হইবে না।

ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম—'এত সোনা! এর দাম যে অনেক।'

ভূত বলিল—'সেইজন্যেই তো কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনে। এখন আপনি ভরসা।'

চমকিয়া উঠিলাম—'আমি। আমি কি করব।'

ভূত মিনতির স্বরে বলিল—'ঘটিটা খুঁড়ে বার করতে হবে। বেশি খুঁড়তে হবে না, হাত খানেক খুঁড়লেই পাওয়া যাবে—'

'কিন্তু খুঁড়বে কে? আমি?'

ভূতের চক্ষু নীরবে অনুনয় জানাইল। আমি চটিয়া বলিলাম—'বেশ ভূত তো আপনি! ও বাগান এখন নিকুঞ্জ পালের দখলে, সে আমাকে খুঁড়তে দেবে কেন? আর আমিই বা তাকে বলব কি? বলব, মশায়, আপনার বাগানে মোহর পোতা আছে তাই খুঁড়তে এসেছি?'

ভূত বলিল—'না না আপনি দিনের বেলা যাবেন কেন? দুপুর রাত্রে চুপি চুপি পাঁচিল ডিঙিয়ে—নিমগাছটা বাড়ি থেকে অনেক দূরে, বাগানের এক কোণে—রাত্রে বাগানে কেউ থাকে না—'

আমি বিড়ি ধরাইবার উপক্রম করিয়া বলিলাম—'মাপ করবেন, আমার দ্বারা হবে না। রাত্রিবেলা পরের বাগানে যদি ধরা পড়ি,

ঠ্যাংয়ে দড়ি পড়বে। নিকুঞ্জ পাল এমনিতেই আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। আমি পারব না।'

দেশলাই জ্বালিলাম।

তারপর কয়রাত্রি উপর্যুপরি ভূতের সঙ্গে ঝুলোঝুলি চলিল। আমি অটল, ভূতও নাছোড়বান্দা। আমি যত বলি—'পারব না', ভূত ততই বলে—'দয়া করুন'। যে-রাত্রির দৃশ্য লইয়া আরম্ভ করিয়াছি, তাহার পরও কয়েক রাত্রি কাটিয়া গেল। হঠাৎ দেশলাই জ্বালিয়া ভূতকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ভূতের এখন দেশলাই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হইয়া গেলেও আবার ফিরিয়া আসে এবং কাতর কণ্ঠে বলে—'দয়া করুন। সদ্‌বংশের মেয়ে, নষ্ট হয়ে যাবে।'

আমার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। রাত্রে ঘুম নাই; সারারাত্রি ভূতের সঙ্গে তর্ক করিতেছি। উপন্যাস লেখা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একদিন মরীয়া হইয়া বলিলাম--'বেশ, রাজি আছি। কিন্তু আমাকেও মোহরের ভাগ দিতে হবে।'

ভূত মুচ্ছুদ্দি; সে ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া বলিল—'বেশ, আপনি পাঁচ পারসেণ্ট দালালী পাবেন। পাঁচখানা মোহর আপনার।'

অতঃপর আর 'না' বলিবার উপায় রহিল না। পাঁচখানা মোহর, মানে পাঁচশত টাকা। পাঁচশত টাকার জন্য অতি বড় দুঃসাহসিক কাজ করিবেন না এমন সাহিত্যিক কয়জন আছেন? আমার দুঃখ এই যে বাকি পঁচানব্বইটি মোহর হজম করিতে পারিব না। পেটের দায়ে কুৎসিত উপন্যাস লিখি বটে, কিন্তু চুরি করিতে পারিব না। তাছাড়া, চুরি করিয়া যাইব কোথায়, নন্দদুলাল মুচ্ছুদ্দির হাত এড়াইব কি করিয়া?

রাত্রি আড়াইটার সময় প্রেতের অনুগামী হইয়া বাহির হইলাম। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি চাঁদ ছিল, তাহারই আলোয় পাঁচিল

টপকাইয়া নিকুঞ্জ পালের বাগানে ঢুকিলাম। ভূত দেখিয়া যাহা হয় নাই তাহাই হইল, বুকের ভিতর দুম্‌দাম শব্দ হইতে লাগিল।

ভূত দেখাইয়া দিল, এক স্থানে কয়েকটা কোদাল শাবল খন্তা পড়িয়া আছে। একটা খন্তা তুলিয়া লইলাম। ভূত পথ দেখাইয়া নিমগাছ-তলায় লইয়া গেল। নিমগাছ-তলায় একটা স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভূত কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া তদারক করিতে লাগিল, আমি খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম। চারিদিকে নিশুতি, কোথাও সাড়াশব্দ নাই; মনে হইল আমিও মানুষ নই, কোন্ স্বপ্নসঙ্কুল সূক্ষ্ম জগতের বাসিন্দা।

আধঘণ্টার মধ্যে ঘটি লইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ঘটির গায়ে সবুজ রঙের কলঙ্ক, কিন্তু ভিতরে একশত নিষ্কলঙ্ক আকব্বরী মোহর ঝক্‌মক্ করিতেছে।

ভূত আত্মাভিমানসূচক একটা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল—'কি বলেছিলাম!'

আমার গায়ে তখন কালঘাম ঝরিতেছে। ফস্ করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া আমি একটা বিড়ি ধরাইলাম। ভূতকে বেশি আস্কারা দেওয়া ভাল নয়।

পরদিন সকালবেলা আবার ঘটি খুলিয়া দেখিলাম, স্বপ্ন নয় মায়া নয় মতিভ্রম নয়, সত্যই একশত মোহর। তাহার মধ্যে হইতে পাঁচটি সরাইয়া রাখিয়া বাকি পঁচানব্বইটি পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া বাহির হইলাম। আর দেরি নয়। সোনার মোহ বড় মোহ; বেশিক্ষণ কাছে রাখিলে হয়তো লোভ সামলাইতে পারিব না।

বেনে পাড়ার একপ্রান্তে গোপীদুলালের বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিলাম। নোনা-ধরা চটা-ওঠা বাড়ি; তাহার সম্মুখে ঝাঁকড়া-চুলো একটি ছোকরা শিস্ দিতে দিতে পায়চারি করিতেছে। আমি দ্বারের

কড়া নাড়িতেই ছোকরা আমার পানে অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরিয়া পড়িল।

একটি মেয়ে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল; তারপর অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া একটু ভিতর দিকে সরিয়া গিয়া নতনেত্রে দাঁড়াইল, স্খলিত স্বরে বলিল—'কাকে চান? বাবা বাড়ি নেই।'

বুঝিলাম গোপীদুলালের আইবুড় মেয়ে। গায়ের রঙ ফরসা, মুখখানি নরম ও সুশ্রী। সর্বাঙ্গে ভরা যৌবন। কিন্তু চোখেমুখে আতঙ্ক, যেন নিজের যৌবনের ভয়ে সর্বদা ত্রস্ত-চকিত হইয়া আছে। পরিধানে বোধ করি বাপের একখানা অর্ধমলিন ধুতি; গায়ে ব্লাউজের অভাব ঢাকা দিবার জন্য আঁচলটা বুকের উপর দুইফের করিয়া জড়ানো।

আমার কণ্ঠ যেন কে চাপিয়া ধরিল। গলা ঝাড়া দিয়া বলিলাম—'এটা কি গোপীদুলালবাবুর বাড়ি?'

'হাঁ।'

'তিনি বাড়ি নেই? কখন ফিরবেন?'

'হাসপাতালে গেছেন। ফিরতে বোধ হয় দেরি হবে।'

'ও—' আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম—'তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার ছিল। আমি ওবেলা আবার আসব। তাঁকে ব'লে দিও।'

মেয়েটি চকিতে চোখ তুলিল।

'আচ্ছা।'

আমার খোলার ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটার পর একটা বিড়ি টানিতে লাগিলাম। মাথা গরম হইয়া উঠিল; দুই বাণ্ডিল বিড়ি নিঃশেষ হইয়া গেল। ভয়-চকিত যৌবন, দুঃসহ অসহায় যৌবন, আপনার মাংস হরিণীর বৈরী—

ভূতের সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু ভূত দিনের বেলা আসে না।

অপরাহ্ণে আবার গেলাম। এবার দালালীর মোহর পাঁচটিও লইয়া গেলাম। মেয়েটি দ্বার খুলিয়া দিল। বলিল—'বাবার শরীর বড় খারাপ, দেখা করতে পারবেন না। কী দরকার আপনার?' তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার নাম কি?'

ত্রাস-বিস্ফারিত চোখ তুলিয়া হ্রস্বকণ্ঠে সে বলিল—'কমলা।'

আমি বলিলাম—'কমলা, তোমার বাবাকে বল, আমার কাছে তাঁর কিছু টাকা পাওনা আছে, তাই দিতে এসেছি।'

দ্বারের ছায়ান্ধকার হইতে সে বিহ্বল চক্ষে আমার পানে চাহিল, তারপর ছায়ার মত অদৃশ্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'আসুন।'

গোপীদুলালবাবু বিছানায় অর্ধোপবিষ্ট হইয়া হাঁপাইতেছিলেন। অকালবৃদ্ধ জীর্ণ মানুষ, চোখে উৎকণ্ঠা-ভরা ক্লান্তি। আমি পাশে বসিলে বলিলেন—'আপনাকে—? টাকা পাওনা আছে মনে পড়ে না তো।'

আমি বলিলাম—'টাকার কথা পরে বলব। এখন আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমি আপনার স্বজাতি, ভদ্রসন্তান। আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

গোপীদুলাল দিশাহারা হইয়া গেলেন। আমি বিস্তারিতভাবে নিজের পরিচয় দিলাম; তাঁহার হাঁপানি যেন আরও বাড়িয়া গেল। শেষে বলিলেন—'কমলার বিয়ে দিতে পারব এ আমার আশার অতীত। আমার তো পয়সা নেই।'

'আছে বৈকি! এই যে—' বলিয়া আমি পুঁটুলি খুলিয়া একশত মোহর তাঁহার সম্মুখে ঢালিয়া দিলাম।

*　　　　*　　　　*

কমলাকে বিবাহ করিয়াছি। শ্বশুর মহাশয় কিন্তু টিকিলেন না, বিবাহের পরদিনই মারা গেলেন! আকস্মিক ভাগ্যোন্নতি তাঁহার সহ্য হইল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুদের ঋণ শোধ করিয়াছি; পুস্তক-প্রকাশকের ব্যবসা ফাঁদিবার আয়োজন করিতেছি। উপন্যাসখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। এবার একখানা রোমান্স-ভরা ভদ্র উপন্যাস ধরিব; যাহা পড়িয়া কমলা লজ্জা পাইবে না।

নন্দদুলালের সহিত আর একবার মাত্র দেখা হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম—'কেমন, খুশি হয়েছেন তো?'

নির্লজ্জ প্রেত চোখ টিপিয়া মুচকি হাসিয়াছিল। 'দালালী একটু বেশি নিয়েছ' বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

ভূতের কৃপায় আমার ভবিষ্যৎ এখন বেশ উজ্জ্বল।

ভক্তিভাজন

মাতালকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবার প্রথা আমাদের দেশে নাই। বরঞ্চ মাতালের প্রতি কোনও প্রকার সহানুভূতি দেখাইলে বন্ধু-বান্ধব সন্দিগ্ধ হইয়া ওঠেন, গৃহিণীর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়। বস্তুত মদ্য পান করা যে অতিশয় গর্হিত কার্য, বোম্বাই প্রদেশে বাস করিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু তবু আমার প্রতিবেশী ব্রাগাঞ্জা সাহেবকে যে আমি সম্প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সত্যের অনুরোধে তাহাও মানিয়া লইতে আমি বাধ্য।

ব্রাগাঞ্জা একজন গোয়াঞ্চি পিদ্রু। এদেশে গোয়ানী খৃষ্টানরা সাধারণত ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রাগাঞ্জার চেহারাটি যেমন প্যাণ্টলুনপরা গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের মতন, মানুষটিও অতিশয় শান্ত-শিষ্ট ও নির্বিরোধ। আমার বাড়ির পাশে একটা খোলার ঘরে বাস করিত এবং মোটরমিস্ত্রীর কাজ করিত। আমি কখনও তাহাকে শাদা-চক্ষু অবস্থায় দেখি নাই; সর্বদাই তাহার গোলাপী চক্ষু দুটি ঢুলুঢুলু। আমার সঙ্গে দেখা-হইলে কোমল হাস্য করিয়া কপালে হাত ঠেকাইত। দুনিয়ার কাহারও সহিত তাহার অসদ্ভাব আছে এমন কথা শুনি নাই; মাতাল অবস্থাতেও সে কাহারও সহিত ঝগড়া করিত না। আবার কাহারও সহিত অতিরিক্ত মাখামাখিও ছিল না। সে আপন মনে মদ খাইত এবং বানচাল মোটরের তলায় প্রবেশ করিয়া ঠুক্‌ঠাক্ করিত।

গত মহাযুদ্ধের সময় বোম্বাই শহরে মানুষের যে জোয়ার আসিয়াছিল

তাহা বোম্বাই শহরকে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া উপকণ্ঠেও প্রবাহিত হইয়াছিল। আমি থাকি উপকণ্ঠে। এতদিন বেশ নিরিবিলি ছিলাম, আমার বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে খোলা মাঠ পড়িয়া ছিল। ক্রমে সেখানে দুটি-একটি টিনের চালা বা ঘর দেখা দিতে আরম্ভ করিল।

একদিন দেখিলাম আমার বাড়ির ঠিক সম্মুখে কোনও এক ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এক চায়ের দোকান খুলিয়া সাইনবোর্ড লট্‌কাইয়া দিয়াছে—শ্রীবিলাস হিন্দু হোটেল। নিতান্তই দীনহীন ব্যাপার; টিনের চালার নীচে কয়েকটি বার্নিশহীন কাঠের টেবিল ও লোহার চেয়ার। কিন্তু খদ্দের জুটিতে বিলম্ব হইল না। এদিকে তখন মার্কিন গোরার ভিড়। দেখিলাম, শাদা সিপাহীরা লোয়ার চেয়ারে বসিয়া অম্লানবদনে চা ও চিঁড়েভাজা খাইতেছে। দোকানদার লোকটা রোগাপটকা ছিল, দেখিতে দেখিতে খোদার খাসী হইয়া উঠিল।

সাহেবদের দেখাদেখি দেশী খদ্দেরও অনেক জুটিয়াছিল। কিন্তু ব্রাগাঞ্জাকে কোনও দিন দোকানে ঢুকিতে দেখি নাই। চায়ের মতন নিরামিষ নেশায় তাহার রুচি ছিল না।

তারপর একদিন মহাযুদ্ধ শেষ হইল। সাহেব সিপাহীরা ক্রমে ভারতরক্ষারূপ নিঃস্বার্থ কর্তব্য শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেল। শ্রীবিলাস হোটেলের চায়ের ব্যবসাতেও ভাটা পড়িল।

কিন্তু ব্যবসায়ে ভাটা পড়িলে ব্যবসায়ীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে; তখন সে মরীয়া হইয়া আবার ব্যবসা জাঁকাইবার নানা ফন্দি-ফিকির বাহির করিতে থাকে। একদিন লক্ষ্য করিলাম, শ্রীবিলাস হোটেলের স্বত্বাধিকারী গ্রামোফোন কিনিয়াছে এবং তাহাতে লাউড্-স্পীকার লাগাইয়া তারস্বরে তাহাই বাজাইতেছে।

প্রথমটা বিশেষ বিচলিত হই নাই। সিনেমার বর্ণসঙ্কর গান আমার

ভালই লাগে; তাহাতে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর উচ্চ গাম্ভীর্য না থাক, প্রাণ আছে, চঞ্চলতা আছে। তাহাই বা আজকাল কোথায় পাওয়া যায়? কিন্তু যখন দেখিলাম, দোকানদার মাত্র দুই তিনটি রেকর্ড কিনিয়াছে এবং সেগুলি একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে বাজাইয়া চলিয়াছে, তখন মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সঙ্গীত ভাল জিনিস; কিন্তু সকাল পাঁচটা হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত যদি একই সঙ্গীত বারম্বার শুনিতে হয়, তাহা হইলে স্নায়ুমণ্ডলের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা মনুষ্যজাতিকে অনেক নব নব আবিষ্কার দান করিয়াছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর দান বোধ হয়—যান্ত্রিক শব্দ। শতবর্ষ পূর্বেও পৃথিবীতে এত শব্দ ছিল না। মেঘগর্জনই তখন শব্দের চূড়ান্ত বলিয়া মনে হইত। এখন মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে এমন শব্দ সৃষ্টি করিয়াছে যাহার কাছে বজ্রপাতও কপোত-কূজন বলিয়া মনে হয়। লাউড্-স্পীকার যুক্ত গ্রামোফোনও এইরূপ একটি শব্দ-যন্ত্র। 'এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়, দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।' শুধু বিস্ময় নয়, মানুষ এই শব্দের আক্রমণে কেমন যেন জবুথবু হইয়া গিয়াছে!

শরীরের একই স্থানে যদি ক্রমাগত হাত বুলানো হয় তাহা হইলে প্রথমটা বেশ আরাম লাগে কিন্তু ক্রমে অসহ্য হইয়া ওঠে। গান শোনাও তেমনি। প্রত্যহ প্রত্যুষ হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন একই গান শুনিতে শুনিতে স্নায়ুমণ্ডলী বিদ্রোহ করে। প্রাণ ছট্‌ফট্ করে; ইচ্ছা করে কোথাও ছুটিয়া পলাইয়া যাই।—কিন্তু যাঁহারা শহরের বাসিন্দা তাঁহাদের পক্ষে এ-জাতীয় অভিজ্ঞতা নূতন নয়; সুতরাং বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

মরীয়া হইয়া একদিন দোকানদারকে গিয়া বলিলাম, 'বাপু, চায়ের দোকান করেছ তা এত গান বাজনার কী দরকার?'

দোকানদার এক গাল হাসিয়া বলিল, 'শেঠ্, গ্রামোফোন কেনার পর আমার খদ্দের বেড়েছে।'

দেখিলাম কথাটা মিথ্যা নয়; অনেকগুলি গলায়-রুমাল-বাঁধা হাফ্-শার্ট-পরা ছোকরা বসিয়া চা খাইতেছে ও টেবিল বাজাইতেছে। বলিলাম, 'খদ্দেরকে গান শোনানোই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে আস্তে বাজাও না কেন? পাড়ার লোকের কান ঝালাপালা ক'রে কি লাভ?'

সে বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কেন, আপনি কি গান ভালবাসেন না? এ দেশের লোক কিন্তু খুব গান ভালবাসে।'

চলিয়া আসিলাম। লোকটা আমাকে সঙ্গীত-রস-বঞ্চিত পাষণ্ড মনে করিল তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সে যে আমার অনুরোধে গ্রামোফোন বন্ধ করিয়া ব্যবসার ক্ষতি করিবে এমন সম্ভাবনা দেখিলাম না।

পুলিশে খবর দিব কিনা ভাবিতে লাগিলাম। এদেশে আইনকানুন নিশ্চয় একটা কিছু আছে; যন্ত্র-সঙ্গীতের উৎপীড়ন হইতে নিরীহ মানুষকে রক্ষা করিতে পারে এমন আইন কি নাই? হয়তো আছে: কিন্তু পুলিশ কিছু করিবে কি? এদেশের পুলিশের সে রোয়াব নাই, গাম্ভীর্য নাই, দাপট্ নাই। রাস্তার ধারে যে-সব হলদে শামলাপরা কনস্টেবল দেখিয়াছি তাহারা মনে সম্ভ্রম উৎপাদন করে না; তাহাদের দেখিলে ইয়ার্কি দিবার ইচ্ছা হয়, নালিশ জানাইবার ইচ্ছা হয় না। আমি যদি নালিশ করি, পুলিশ হয়তো মিঠেভাবে একটু মুচ্‌কি হাসিবে। তাহাতে আমার কী লাভ?

এইভাবে মাসখানেক চলিল। স্নায়ু বলিয়া শরীরে যাহা ছিল ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া জট পাকাইয়া গিয়াছে; মস্তিষ্কের মধ্যে চাতক পাখীর কাত্‌রানির মতো একটা ব্যাকুলতা পাকাইয়া পাকাইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। ডাক্তারেরা

যাহাকে নার্ভাস্ ব্রেক্-ডাউন বলেন সেই অবস্থায় পৌঁছিতে আর বিলম্ব নাই। এমন সময়—

পরিত্রাণায় সাধুনাং—ইত্যাদি।

ত্রাণকর্তা যে কত বিচিত্ররূপে সম্ভবামি হন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অপার তাঁহার মহিমা।

রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় একদিন বাড়ির সমস্ত বিদ্যুৎবাতি নিভিয়া গিয়াছিল। এত রাত্রে কোথায় মিস্ত্রী পাইব; ব্রাগাঞ্জার কথা মনে পড়িল। সে মোটর-মিস্ত্রী, নিশ্চয় বিদ্যুৎ সম্বন্ধে জানে শোনে। তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

সম্মুখের হোটেলে তখন উদ্দাম সঙ্গীত চলিয়াছে—'পহেলি মোহব্বত কি রাত!' অন্ধকারে প্রথম প্রণয়-রজনীর উল্লাস যেন আরও গগনভেদী মনে হইতেছে।

ব্রাগাঞ্জা আসিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে আলো জ্বালিয়া দিল। বিশেষ কিছু নয়, একটা ফিউজ পুড়িয়া গিয়াছিল। আমি ব্রাগাঞ্জাকে একটি টাকা দিলাম। তৈলাক্ত হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল; কপালে হাত ঠেকাইয়া সে বলিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।'

দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে একবার থামিল: একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'স্যর, এই গান শুনতে আপনার ভাল লাগে?'

লক্ষ্য করিলাম, তাহার ঢুলুঢুলু চক্ষের মধ্যে ফুলঝুরির ফুলকির মতন একটা আলো ঝিকমিক্ করিতেছে। বলিলাম, 'ভাল লাগে! অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তুমিও তো দিনরাত শুনছ, ভাল লাগে?'

ব্রাগাঞ্জা মাথাটি দক্ষিণ হইতে বামে আন্দোলিত করিতে করিতে বলিল, 'না, ভাল লাগে না।'

ব্রাগাঞ্জা চলিয়া গেল। নিজের ঘরে গেল না; এত রাত্রে

অপ্রত্যাশিত একটি টাকা পাইয়াছে, বোধ হয় মদের সন্ধানে গেল। ওদিকে গান চলিয়াছে—'লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা—'

রাত্রি সাড়ে দশটা। শুইতে গিয়া কোনও লাভ আছে কিনা ভাবিতেছি এমন সময় শ্রীবিলাস হোটেলে রৈ রৈ মার্ মার্ শব্দ হইয়া গ্রামোফোনটা মধ্যপথে থামিয়া গেল; তৎপরিবর্তে চীৎকার চেঁচামেচি দুম্‌দাম্ শব্দ আসিতে লাগিল।

ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। দেখি, হোটেলে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গিয়াছে। তফাৎ এই যে দক্ষযজ্ঞে অনেকগুলা ভূত যজ্ঞ পণ্ড করিয়াছিল, এখানে একা ব্রাগাঞ্জা। সে একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে; তাহাকে দেখিয়া সেই নিরীহ নির্বিরোধ ব্রাগাঞ্জা বলিয়া চেনা শক্ত। গ্রামোফোনটাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া সে তাহার উপর তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, টেবিল চেয়ার পেয়ালা গেলাস যাহা সম্মুখে পাইতেছে তাহাই ধরিয়া আছাড় মারিতেছে। আর গভীর গর্জনে বলিতেছে— 'ড্যাম্ লারে লাপ্পা—টু হেল্ উইথ গিলি গিলি গিলি—ডেভিল্ টেক্ পহেলি মোহব্বৎ কি রাত······'

রাস্তায় দাঁড়াইয়া দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। হোটেলের মালিক ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া ঐক্যতানে চেঁচাইতেছে; কিন্তু এই দুর্দান্ত মাতালকে বাধা দিবার সাহস তাহাদের নাই।

* * * *

মদমত্ত অবস্থায় পরের সম্পত্তি নাশ করার অপরাধে ব্রাগাঞ্জার জেল ও জরিমানা হইল। জেল খাটিয়া আসিয়া ব্রাগাঞ্জা পূর্ববৎ মোটর মেরামত করিতেছে; যেন কিছুই হয় নাই। কিন্তু শ্রীবিলাস হোটেলের গ্রামোফোন বাজনা বন্ধ হইয়াছে। ব্রাগাঞ্জা নাকি দোকানের মালিককে

ইসারায় জানাইয়াছে যে, আবার গ্রামোফোন বাজিলে আবার সে দক্ষযজ্ঞ বাধাইবে।

ব্রাগাঞ্জাকে আমি ভক্তি করি, তা যে যাই বলুন। মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া যাইবার সাহস যাহার আছে সে আমাদের সকলেরই নমস্য।

একদিন তাহাকে ডাকিয়া তাহার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিলাম—'সেদিন তুমি আমার বিদ্যুৎবাতি মেরামত করে দিয়েছিলে তার জন্যে তোমাকে উচিত পুরস্কার দিই নি। এই নাও।'

ব্রাগাঞ্জা কপালে হাত ঠেকাইয়া সলজ্জ মিটিমিটি হাসিল। সে মাতাল হইলেও নির্বোধ নয়।

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।'

সম্প্রতি মদ্য-নিবারণী আইন জারি হইয়াছে; কিন্তু সেজন্য ব্রাগাঞ্জার আটকায় না।

গ্রন্থিরহস্য

গোদার মতন এমন সচ্চরিত্র এবং গম্ভীর প্রকৃতির বানর আমি আর দেখি নাই। ইহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, গোদা বাংলাদেশের বানর নয়। শুনিয়াছি, সুমাত্রা কি বোর্নিও কি ঐ রকম একটা দ্বীপ তাহার জন্মস্থান।

গোদাকে বানর না বলিয়া অতি-বানর বলা চলে। শুধু তাহার স্বভাব-চরিত্রের জন্য নয়, তাহার চেহারাটাও সাধারণ বানরের তুলনায় প্রকাণ্ড। সোজা হইয়া দাঁড়াইলে তাহার খাড়াই পাঁচ ফুটের কম হইত না। গায়ে জোরও ছিল অমানুষিক, তিন সুতের লোহার ছড় দুই হাতে বাঁকাইয়া দু'ভাঁজ করিয়া দিতে পারিত।

কিন্তু গোদার গুণগ্রাম ব্যাখ্যা করিবার আগে তাহার মালিক শশধরবাবুর কথা বলা উচিত। শশধরবাবু সম্বন্ধে এমন অনেক কথা আমি জানি যাহা আর কেহ জানে না; পনরো বছর ধরিয়া আমি তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক ছিলাম। পারিবারিক চিকিৎসক কথাটা বোধ হয় ঠিক হইল না। কারণ শশধরবাবুর পরিবারের মধ্যে তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার বানর গোদা ছাড়া আর কেহ ছিল না।

শশধরবাবু আদৌ দরিদ্র ছিলেন। তারপর পঁচিশ বছর বয়সে তিনি এক ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেন যে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উপার্জন না করিয়া তিনি সংসারধর্ম কিছুই করিবেন না। অতঃপর ত্রিশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। শশধরবাবু নানাবিধ ব্যবসা করিয়া ধনী হইয়াছেন, কলিকাতার সবচেয়ে মূল্যবান পাড়ায় বাগান-ঘেরা বাড়ি করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহাদি

করেন নাই। তিনি মিশুক এবং মিষ্টভাষী লোক কিন্তু বাজারে তাঁহার দুর্নাম ছিল। পরদ্রব্য সম্বন্ধে তাঁহার নাকি তিলমাত্র বিবেকবুদ্ধি নাই। তাঁহার সমধর্মী ব্যবসায়ীরা সকলেই তাঁহাকে ভয়ে ভক্তি করিত এবং আড়ালে শশধরবাবু না বলিয়া বিষধরবাবু বলিত।

শশধরবাবুর বয়স এখন পঞ্চান্ন বছর। বছর চারেক আগে তিনি কোথা হইতে গোদাকে আনিয়া বাড়িতে পুষিলেন। গোদা তখনও পূর্ণ-বয়স্ক হয় নাই, কিন্তু তাহার আকৃতি দেখিয়া পাড়া-পড়্শীর তাক্ লাগিয়া গেল। তবু কেহই বিস্মিত হইল না। শশধরবাবুর মত যাহাদের একক অবস্থা তাহারা টিয়াপাখী পোষে, কুকুর বেড়াল পোষে; শশধরবাবু বানর পুষিয়াছেন, ইহাতে বিস্ময়ের কী আছে? ইহার মধ্যে যে বহুদূরদর্শী বিষয়বুদ্ধি থাকিতে পারে, তাহা কাহারও মাথায় আসিল না।

গোদা কিছুদিন শিকলে বাঁধা রহিল, তারপর শশধরবাবু তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। বাড়ির সর্বত্র তাহার গতিবিধি, কিন্তু সে কোনও প্রকার দৌরাত্ম্য করিল না, একটা কাঁচের গ্লাস পর্যন্ত ভাঙিল না। বাগানেও সে যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কখনও গাছের একটা পাতা ছেঁড়ে না। বানরের এইরূপ আদর্শ চরিত্র দেখিয়া সকলে মুগ্ধ। ক্রমে শশধরবাবু তাহাকে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাতায়াত করিতে শিখাইলেন। আমাকে ডাকিবার প্রয়োজন হইলে গোদার হাতে চিঠি দিয়া আমায় পাঠাইতেন। গোদা আসিয়া দ্বারের কড়া নাড়িত, দ্বার খুলিলে চাকরের হাতে চিঠি দিয়া গম্ভীর মুখে বেঞ্চিতে বসিয়া থাকিত। তারপর চিঠির উত্তর লইয়া মন্থমন্থর পদে ফিরিয়া যাইত।

গোদার কার্যকলাপ প্রথমটা পাড়ায় খুবই উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল কিন্তু ক্রমে তাহা সহিয়া গেল। গোদা পরিচিত দশজনের একজন হইয়া দাঁড়াইল।

এইভাবে দিন কাটিতেছে, শশধরবাবু একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গোদা চিঠি লইয়া আসিয়াছিল, তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। শশধরবাবুর বাড়ি আমার বাড়ি হইতে মিনিট পাঁচেকের পথ।

শশধরবাবু একাকী ড্রয়িং রুমে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমরা প্রবেশ করিলে বলিলেন—'এই যে ডাক্তার, এস। গোদা, তুই ঐ কোণের চেয়ারে বোস্ গিয়ে।'

গোদা মুখে অমায়িক গাম্ভীর্য লইয়া কোণের চেয়ারে বসিল। শশধরবাবু তখন সোফায় আমার পাশে উপবিষ্ট হইলেন। লক্ষ্য করিলাম তাঁহার মুখে-চোখে একটা চাপা উত্তেজনা, পঞ্চান্ন বছরের শুষ্ক শরীরেও যেন এই উত্তেজনার আমেজ লাগিয়াছে। তিনি গলায় গিট্‌কারি দিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন—'একটা সুখবর আছে। আজ থেকে কাজকর্ম ছেড়ে দিলাম। এবার সংসারধর্ম করব।'

বুঝিলাম, এতদিনে তাঁহার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রোজগার করিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। শীর্ণ গাল-বসা মুখ, চোখের কোলে চামড়া কুঞ্চিত হইয়াছে, মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলি সংখ্যালঘু হইয়া মস্তকের লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। ঝুনা চেহারা। কাজকর্ম হইতে অবসর লইবার উপযুক্ত সময় বটে। কিন্তু সংসারধর্ম! জীবনের তিন ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যে কাটাইয়া এই শরীরে নূতন করিয়া সংসার পাতা চলে কি?

মুখে মামুলি অভিনন্দন জানাইয়া বলিলাম—'তা বেশ তো, ভালই। আপনার এত টাকা ভোগ করবার লোক চাই তো!'

তিনি বলিলেন—'শুধু তাই নয়, নিজেরও তো ভোগ করা চাই। তোমাকে ডেকেছি, আমার শরীরটা ভাল করে পরীক্ষা করবে। শরীর

অবশ্য ভালই আছে। তুমি তো জানোই, রোগ-টোগ আমার কিছু নেই। তবে—'

তাঁহার মনের কথা বুঝিলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল শরীরে ব্যাধি কিছু নাই বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়াছে। এ বয়সে তাহা অস্বাভাবিক নয়। কাশিয়া বলিলাম—'হ্যাঁ—তা—শরীর তো বেশ ভালই। তবে সংসারধর্ম করার ধকলও তো আছে—আপনার অভ্যেস নেই—'

শশধরবাবু বলিলেন—'তোমার কথা বুঝেছি। আমি এর জন্যে তৈরী ছিলাম। তবে শোনো, আমি মতলব করেছি ভিয়েনায় যাব।'

'ভিয়েনা!'

'হ্যাঁ, ভরোনফ্ চিকিৎসার কথা জানো তো?'

'ভরোনফ্ চিকিৎসা! ওঃ—'

'আমার সন্দেহ ছিল, তাই গোদাকে পুষেছি। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব—সস্তায় ভাল জিনিস হবে। বুঝেছ?'

চোখের ঠুলি খসিয়া পড়িল। শশধরবাবু প্রকৃতির নিকট পরাজিত হইবেন না, তাই চার বছর ধরিয়া গোদাকে পুষিতেছেন! এখন ভিয়েনায় গিয়া গোদার গ্ল্যাণ্ড্ নিজের দেহে কলম লাগাইবেন, গোদার যৌবন আত্মসাৎ করিয়া নিজে যুবক হইবেন। তাঁহার বৈষয়িক দূরদর্শিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

শশধরবাবু ডাকিলেন—'গোদা, এদিকে আয়।'

গোদা তৎক্ষণাৎ পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া আমার পানে চাহিয়া হাসিলেন, বলিলেন—'কেমন হবে মনে হচ্ছে?'

আমি ডাক্তার, গ্রন্থি-বদল বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা। সুতরাং সায়

দিতে হইল। গোদাকে লক্ষ্য করিলাম, সে সপ্রশ্নভাবে আমাদের মুখের পানে চাহিতেছে, যেন আমাদের আলোচনার মর্মানুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সে বানর, আমাদের কুটিল অভিসন্ধি বুঝিল না।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—'গোদা কিন্তু বাঁচবে না। তখনি তখনি মরবে না বটে, কিন্তু দু'চার মাসে শুকিয়ে মরে যাবে।'

শশধরবাবু বলিলেন—'সে কথাও ভেবেছি। আমার গ্ল্যাণ্ড্ তো ফেলাই যেতো, ওর গায়ে বসিয়ে দেব। তাতে কিছুদিন টিকবে।'

হয়তো টিকিবে এবং মানুষের গ্রন্থি বানরের গায়ে বসাইলে কিরূপ ফল হয়, তাহারও একটা পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষার ফল যে কিরূপ অদ্ভুত দাঁড়াইবে, তাহা তখনও জানিতাম না। শশধরবাবুকে নমস্কার করিয়া এবং গোদার সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া চলিয়া আসিলাম।

তারপর শশধরবাবু গোদাকে লইয়া ভিয়েনা গেলেন এবং মাস কয়েক পরে ফিরিয়া আসিলেন।

দেখা করিতে গেলাম। ফটকের কাছে গোদা বসিয়া আছে। তাহার চেহারার কোনও তারতম্য দেখিলাম না; মুখ তেমনি গম্ভীর। আমার পানে কপিশ-পিঙ্গল চোখ তুলিয়া চাহিল। মনে হইল তাহার চোখে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ঝিলিক মারিয়া উঠিল।

বাড়ির বারান্দায় শশধরবাবু ছিলেন। চেহারার সত্যই উন্নতি হইয়াছে; বয়স দশ বছর কম বলিয়া মনে হয়। আমি সহাস্যে বলিলাম—'এই যে, দিব্যি উন্নতি হয়েছে দেখছি।'

অতঃপর তিনি যেরূপ ব্যবহার করিলেন তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তিনি আরক্ত নয়নে বলিলেন—'উন্নতি হয়েছে! তুমি আমার সর্বনাশ করেছ! তুমি যদি মানা করতে তাহলে একাজ আমি

করতাম না। যাও—বেরোও! আর যদি আমার বাড়িতে পা দাও, মার খেতে হবে।' বলিয়া ফটকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

হতভম্ব হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মাথার মধ্যে একঝাঁক দুশ্চিন্তা তাল পাকাইতে লাগিল! এ কী অভাবনীয় পরিবর্তন! শশধরবাবু হাসিমুখে মানুষের গলায় ছুরি দিতে পারেন, কিন্তু কটু কথা বলিতে আজ পর্যন্ত তাঁহাকে কেহ শোনে নাই। তবে কি হিতে বিপরীত হইয়াছে। গোদার তেজালো গ্রন্থি শশধরবাবুর বুড়া শরীরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ওলটপালট করিয়া দিয়াছে? কোন্ দিক হইতে তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছে?

এই ঘটনার কয়েকদিন পর হইতে পাড়ায় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। একদিন সকালবেলা আমার ডিস্পেন্সারিতে গিয়া দেখি রাত্রে জানালা ভাঙিয়া কেহ ঘরে ঢুকিয়াছিল, ঔষধের শিশি বোতল সমস্ত ভাঙিয়া তচ্ নচ্ করিয়া দিয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার টাকার ঔষধাদি ছিল।

এমন অর্থহীন ধ্বংসলীলায় কাহার কী লাভ? শশধরবাবুর উপর ঘোর সন্দেহ হইল। তিনি আমার উপর চটিয়াছেন, তার উপর বানরের গ্রন্থি তাঁর শরীরে আছে। হয়তো এই সর্বনাশের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন। বানরের গ্রন্থি তাঁহার স্বভাবকে বানরের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে।

তারপর আরও কয়েকটা বাড়িতে উপর্যুপরি অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়া গেল। অজ্ঞাত চোর রাত্রিকালে জানালা ভাঙিয়া বাড়িতে প্রবেশ করে এবং জিনিসপত্র ভাঙিয়া-চুরিয়া চলিয়া যায়; কখনও সোনারূপার দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া যায়।

পাড়ায় হৈ হৈ পড়িয়া গেল। পুলিশে খবর দেওয়া হইল। পাড়ার ছেলেরা লাঠি-সোঁটা লইয়া রাত্রে পাড়া পাহারা দিতে লাগিল।

ইহা যে শশধরবাবুর কীর্তি, তাহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু একথা কাহাকেও বলিবার নয়। বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, উপরন্তু শশধরবাবু হয়তো মানহানির মোকদ্দমা আনিবেন।

আরও কয়েক দিন কাটিল। তারপর হঠাৎ একদিন চোর ধরা পড়িয়া গেল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! চোর শশধরবাবু নয়, গোদা! আমাদের নিরীহ শান্ত-শিষ্ট গোদা, যে-গোদা বিনা অনুমতিতে গাছের একটা পাতা পর্যন্ত ছিঁড়িত না, সে এই কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে!

আমার হিসাবের গোড়াতেই গলদ ছিল। বুঝিলাম, গোদার নিষ্পাপ শরীরে শশধরবাবুর দুষ্ট গ্রন্থি প্রবেশ করিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছে, গোদাকে দুর্জয় চোর করিয়া তুলিয়াছে। গোদা বানর, তাই এত শীঘ্র ধরা পড়িয়া গেল, শশধরবাবু ত্রিশ বছরেও ধরা পড়েন নাই।

শশধরবাবু যে আমার উপর চটিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতেও বাকি রহিল না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে জীবন সম্ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গোদার শুদ্ধ-সাত্ত্বিক গ্রন্থি তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া উল্টা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আশাহত শশধরবাবুর সমস্ত আক্রোশ আমার উপর পড়িয়াছিল।

কিন্তু এখন বোধ হয় আমার উপর আর তাঁহার আক্রোশ নাই। যত দিন যাইতেছে, ততই তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেছে। তিনি নাকি বিবাহ করিবেন না, সংসারধর্মের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। শুনিতেছি তিনি যোগ অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন, শীঘ্রই শ্রীমৎ হনুমানদাস বাবাজী নামক সাধুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

গোদার জন্য কিন্তু বড় দুঃখ হয়। পুলিশ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া লোহার খাঁচায় পুরিয়া রাখিয়াছে, আর শশধরবাবু তাহার গ্রন্থি চুরি করিয়া ব্রহ্মলাভ করিবেন! এর চেয়ে অবিচার আর কি হইতে পারে?

সন্ন্যাস

সংবাদপত্রের ব্যক্তিগত স্তম্ভে একটি বিজ্ঞাপন দেখিলাম—বাবা, মা মারা গিয়াছেন। আপনি এবার ফিরিয়া আসুন।

শ্রীরামধন ঘোষ। ফুলগ্রাম। বাঁকুড়া।

সংবাদপত্রের এই স্তম্ভটি আমার প্রিয়। রোজই পড়ি। ছেলে ম্যাট্রিক ফেল করিয়া পলায়ন করিয়াছে, পিতা বিজ্ঞাপন দিতেছেন—ফিরিয়া এস, বেশী মারিব না। এ ধরণের বিজ্ঞাপন প্রায়ই বাহির হয়। কিন্তু পুত্র পিতাকে অভয় জানাইয়া ফিরিয়া আসিতে বলিতেছে, ইহা সম্পূর্ণ নূতন। আমার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

দেখিলাম, হিমালয়ের সানুদেশে গিরিগুহার সম্মুখে পাঁচজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন; মাঝখানে ধুনী জ্বলিতেছে। সন্ন্যাসীদের চেহারা তপঃক্লশ, মাথা হইতে বটগাছের ঝুরির মত জটা নামিয়াছে। তাঁহারা মিটিমিটি চক্ষে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।

কিন্তু দেহ যতই নিষ্কম্প হোক, আজ তাঁহাদের মন চঞ্চল। ধ্যানধারণায় চিত্ত সমাহিত হইতেছে না। কারণ, গাঁজা ফুরাইয়া গিয়াছে।

গুহা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে একটি ক্ষুদ্র সহর আছে, একজন সন্ন্যাসী সেখানে গাঁজা আনিতে গিয়াছেন। বাকি পাঁচজন কান খাড়া করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

দীর্ঘকাল কাটিবার পর অদূরে নিম্নাভিমুখে নুড়ি গড়াইয়া পড়ার শব্দ হইল। কেহ আসিতেছে। একজন সন্ন্যাসী উঠিয়া উঁকি মারিয়া

দেখিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে হাসির আভাস দেখিয়া অন্য সন্ন্যাসীরা বুঝিলেন, গাঁজা আসিতেছে।

অবিলম্বে ষষ্ঠ সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঝুলি হইতে একটি পুরুষ্টু কাগজের মোড়ক বাহির করিতেই অপেক্ষমান সন্ন্যাসীরা বিদ্যুদ্বেগে নিজ নিজ ঝুলি হইতে গাঁজার কলিকা বাহির করিলেন। দেখিতে দেখিতে গঞ্জিকার ধূমগন্ধে হিমালয়ের সানুদেশ আমোদিত হইয়া উঠিল।

গাঁজার কলিকা নিঃশেষিত হইলে সন্ন্যাসীরা আবার ভবিষ্যুক্ত হইয়া যোগাসনে বসিলেন। মুখমণ্ডল প্রসন্ন, মন কূটস্থ চৈতন্যের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করিতেছে।

একটি সন্ন্যাসীর কিন্তু চিত্ত স্থির হইল না। গাঁজার মোড়ক খবরের কাগজের ছিন্নাংশটা অদূরে পড়িয়া ছিল, তাঁহার মন বারবার সেইদিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। সন্ন্যাসী যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, তখন লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ উসখুস্ করিবার পর তিনি উঠিলেন, কাগজের টুকরাটি কুড়াইয়া লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। কাগজে সংবাদ কিছু নাই, কেবল বিজ্ঞাপন। সন্ন্যাসী তাহাতেই তন্ময় হইয়া গেলেন।

তারপর হঠাৎ একটি বিপুল হর্ষধ্বনি করিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। অন্য সন্ন্যাসীদের চট্‌কা ভাঙিয়া গেল! তাঁহারা বিরক্ত চক্ষু তুলিয়া সন্ন্যাসীর পানে চাহিলেন।

সন্ন্যাসী তখন খবরের কাগজটি পতাকার মত ঊর্ধ্বে নাড়িতে নাড়িতে নৃত্য করিতেছেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন, 'কি হল?'

সন্ন্যাসী ক্ষণেকের জন্য নৃত্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন, 'মরেছে! মরেছে! লাইন্‌ক্লিয়ার!' বলিয়া আবার নাচিতে লাগিলেন।

'কে মরেছে ?'

'বৌ! খাণ্ডার রণচণ্ডী মরেছে। আমি চললাম, ঘরে ফিরে চললাম !'

সন্ন্যাসী নাচিতে নাচিতে অদৃশ্য হইলেন। কাগজখানা পড়িয়া রহিল।

অন্য পাঁচজন সন্ন্যাসী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে সকলের মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল।

একজন হাত বাড়াইয়া কাগজটি তুলিয়া লইলেন, আগাগোড়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার নৃত্য করিবার মত কোনও বিজ্ঞাপনই তাহাতে নাই।

একে একে সকলেই কাগজটি দেখিলেন। সমবেত নাসিকা হইতে দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। তারপর তাঁহারা আর এক দফা গাঁজা চড়াইলেন।

সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসগ্রহণের মূলতত্ত্ব গুহায় নিহিত। এ বিষয়ে পরিসংখ্যান রচনা করা প্রয়োজন। দেশে যে সাধু-সন্ন্যাসী বাড়িয়াই চলিয়াছে, ইহার কারণ কি ?

নূতন মানুষ

এমন আশ্চর্য ব্যাপার পূর্বে কখনও ঘটে নাই। নেপালচন্দ্রের পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া কাঁদিল না, শ্রেফ বলিল, 'পেস্তা!'

নেপালের মনে বড় ধোঁকা লাগিল। এ কি রকম ছেলে? একে তো সে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে একটি আঠারো বছরের তরুণীকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার উপর পাকিস্তানে বাস—চারিদিকে পেস্তা-বাদামখোর মুস্কো জোয়ান ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এরূপ অবস্থায় ছেলে যদি ভূমিষ্ঠ হইয়াই পেস্তার ফরমাস করে তবে কার না সন্দেহ হয়? কিন্তু নেপাল ভাল মানুষ লোক, সে লজ্জায় সন্দেহের কথা কাহাকেও বলিতে পারিল না।

ষষ্ঠীপূজার দিন নেপালের স্ত্রী বলিলেন, 'ছেলের মুখ অবিকল তোমার মত হয়েছে।'

নেপাল অনেকক্ষণ ধরিয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিল; কিন্তু নিজের মুখের সহিত কোন সাদৃশ্যই খুঁজিয়া পাইল না; বরং অত্যন্ত পরিপক্ক ডেঁপো ছেলের মত একটা মুখ। এত অল্প বয়সে মুখ এত পাকিল কি করিয়া নেপাল ভাবিয়া বিস্মিত হইল। শুধু একটা ভরসার কথা, গায়ের রঙ পেস্তাবাদামপুষ্ট কাবুলী ধাঁচের নয়, বরং খাঁটি বাঙালীর মতই নবজলধরকান্তি।

একুশ দিনের দিন আঁতুড় ঘর হইতে বাহির হইয়া নেপালের পুত্র গম্ভীর স্বরে বলিল, 'ইটলি!'

কি সর্বনাশ! নেপাল চমকিয়া উঠিল। 'ইটলি' একপ্রকার

মাদ্রাজী খাদ্য। তাহার মনে পড়িল পুত্রজন্মের নয় দশ মাস পূর্বে সে একবার অল্পদিনের জন্য সস্ত্রীক মাদ্রাজে গিয়াছিল! এত অল্প বয়সে এমন বাচাল ছেলে বাঙালীর ঘরেও দেখা যায় না। তবে কি—তবে কি মাদ্রাজেই কোনও গণ্ডগোল ঘটিয়াছে নাকি?

নেপালের মনে আর সুখ রহিল না। সে ভাবিতে লাগিল, ছেলেটা দেশবিদেশের খাবারের নাম করিতেছে, যদি বাঙালীর ছেলেই হয় তবে সন্দেশ রসগোল্লার নাম করে না কেন? পেস্তা এবং ইটলি কি সন্দেশ রসগোল্লার চেয়েও মুখরোচক? অন্তত পান্তুয়া কিংবা জিলিপি বলিতে পারিত! যে ছেলে অবলীলাক্রমে পেস্তা এবং ইটলি বলিতে পারে তাহার পান্তুয়া বা জিলিপি উচ্চারণ করা কি এতই শক্ত?

তারপর, এক মাস বয়সে নেপালের পুত্র একদিন ঘুম হইতে জাগিয়া হাই তুলিল এবং বলিল, 'নাপ্পি!'

নাপ্পি! নেপাল শিহরিয়া উঠিল। এ যে ক্রমে ভারতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে! যুদ্ধের সময় জাপানীরা বর্মা আক্রমণ করিলে একদল বর্মী পালাইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীর কাছে আশ্রয় লইয়াছিল বটে। হরি হরি!

নেপাল আর থাকিতে পারিল না। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগা, এ ছেলে কোন দেশের মানুষ?'

স্ত্রী হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'ও নতুন যুগের মানুষ। ওর দেশ নেই, সব দেশই ওর দেশ। পৃথিবীর হাওয়া বদলে গেছে বুঝতে পারছ না?'

হয়তো বদলাইয়া গিয়াছে, নেপাল বুঝিতে পারে নাই। হয় তো ভবিষ্যতের ছেলেরা অ্যাটম বোমা হাতে লইয়া রৈ রৈ করিতে করিতে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইবে, তাহাদের দেশকাল পাত্র জ্ঞান থাকিবে না;

বানর বংশে যেমন মানুষ জন্মিয়াছিল, মানুষ বংশে তেমনি অতিবানর জন্মিবে। Evolution না Atavism ?

কিন্তু সে যাহা হোক, সব ছেলেই যদি ঐ রকম হয়, তাহা হইলে অবশ্য এ ছেলেকে সন্দেহ করা চলে না—

নেপাল এইসব চিন্তা করিতেছে এমন সময় শুনিল ছেলে পরিষ্কার বলিতেছে—'ল্যাংচা !'

নেপালের হৃৎযন্ত্র তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। যাক, তবু ছেলে বাঙলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জোড় বিজোড়

খেলিতে বসিয়া যদি খেলার প্রতিপক্ষ না পাওয়া যায়, কিম্বা খেলিতে খেলিতে প্রতিপক্ষ যদি বলে আর খেলিব না, অথবা খেলার সময় এক পক্ষের যদি খেলায় মন না বসে—তাহা হইলে খেলা আর খেলা থাকে না, শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি হইয়া দাঁড়ায়। তা সে তাস-পাশাই হোক, আর জীবনের গভীরতম খেলাই হোক।

কিন্তু খেলার নেশা যাহার কাটে নাই তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, যেমন করিয়া হোক সে খেলিবেই। কানাকড়ি দিয়াও খেলিবে। পৃথিবীতে এই অবুঝ খেলোয়াড়দের লইয়াই বিপদ।

ছয় বৎসর পূর্বে নির্মলের সহিত যখন নির্মলার বিবাহ হইয়াছিল, তখন সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়াছিল। শুধু যে নামের সহিত নাম মিলিয়াছিল তাহা নয়, সব দিক দিয়াই রাজযোটক ঘটিয়াছিল। নির্মল জমিদারের ছেলে হইয়াও নির্মল চরিত্র এবং নির্মলা যেন হিমালয় শৃঙ্গের নিষ্কলঙ্ক তুষার দিয়া গড়া একটি প্রতিমা।

তুইটি তরুণ তরুণী পরস্পর আকৃষ্ট হইয়াছিল যেমন চুম্বক আর লোহা আকৃষ্ট হয়। দার্শনিক উপমা দেওয়া যায়—চণকবৎ। চণকের একটি দানায় যেমন তুইটি দল থাকে সেইরূপ, দ্বিদল হইলেও এমন দৃঢ়সংবদ্ধ যে এক বলিয়া মনে হয়।

যৌবনের বিচিত্র রসে উচ্ছলিত দিনগুলি কাটিতে থাকে, হাসি অশ্রু আনন্দ বিষাদ সমস্তই পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া। জগতে যেন তৃতীয় প্রাণী নাই; বিশ্ব সংসার সঙ্কুচিত হইয়া একটি গৃহের একটী কক্ষে আবদ্ধ হইয়াছে।

একটি গৃহের একটি কক্ষ! বাসক রজনীর স্বপ্ন-সুরভিত পালঙ্ক

নের গভীর কথা ভাষার অপেক্ষা রাখিত না। তাই নির্মলার মনকে ধন ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইল তখন নির্মল দেখিল নির্মলার মন রা-বাঁধার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে ; যে অন্তর্লোকবাসিনী নীরব ইঙ্গিতের র্থ বুঝিত সে এখন ভাষার ভাষ্য ছাড়া কিছুই বোঝে না। স্থূল সংসার নির্মলার অনুভূতিকে স্থূল করিয়া দিয়াছে।

নির্মল বাক্যের দ্বারা অভিযোগ প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত নয়, কুণ্ঠা তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরে। কেবল মর্মমূলে অনির্বাণ মুর্মুর-দহন লিতে থাকে।

একদিন হঠাৎ নির্মলাকে কিছু না বলিয়া নির্মল শিকারে বাহির হইয়া গেল। অন্তঃপুরে নির্মলা দাসীর মুখে সংবাদ পাইয়া একটু অমনা হইল, পূর্বে এমন কখনও ঘটে নাই। তারপর সে গৃহকর্মে ন দিল। মাস-কাবারী বাজার আসিয়াছে। অবহেলা করা চলে না।

নির্মল জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছে ; মাঝে মাঝে শিকারের সন্ধানে বাহির হয়। কিন্তু শিকারে তাহার মন নাই ; আবার বাড়ী ফিরিবার নামেও মন বিমুখ হইয়া ওঠে।

সাত দিন এইভাবে কাটিবার পর হঠাৎ নির্মলের মন দড়ি-ছেঁড়া হইয়া উঠিল। গৃহ আবার তাহাকে টানিতেছে। সে তাঁবু তুলিয়া ফিরিয়া চলিল।

বাড়ী ফিরিয়া নির্মল আপন প্রসাধন কক্ষে বেশবাস পরিবর্তন করিতেছিল, নির্মলা হাসি হাসি মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল— 'একটা মজার জিনিস করেছি। দেখবে এস।'

নির্মল হর্ষোৎফুল্ল চক্ষে নির্মলার পানে চাহিল। এই সাত দিনের ব্যবধান কি আবার তাহাদের মিলাইয়া দিল! অন্তরের ধন কি অন্তরে ফিরিয়া আসিল?

ন পত্নীর পিছু পিছু শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল⋯ ⋯

দেখিল ঘর হইতে তাহাদের প্রকাণ্ড পালঙ্ক অন্তর্হিত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে ঘরের দুই পাশে দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট খাট বিরাজ করিতেছে।

নির্মলা উজ্জ্বল চোখে চাহিয়া বলিল—'কলকাতা থেকে জোড়া খাট কিনে আনিয়েছি, বিলিতী দোকান থেকে। কি সুন্দর স্প্রিংয়ের গদী ন্যাখো। আমি কাছে শুলে যদি তোমার ঘুম নষ্ট হয়—এখন থেকে আলাদা শোব। কেমন, ভাল হয়নি ?'

নির্মল বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শুধু ঘর হইতে নয়, এক ঘণ্টার মধ্যে নির্মল বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। নির্মলা শঙ্কিত হইয়া ভাবিল—কি হল ! এতে রাগের কি আছে !

জানা গেল নির্মল কলিকাতায় গিয়াছে। কয়েকদিন কিছু ঘটিল না। নির্মলা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া সংসারের কাজকর্মে মন দিল ভাবিল—রাগ পড়িলেই ফিরিয়া আসিবে।

পনের দিন পরে নির্মল ফিরিল। সঙ্গে লাল চেলি পরা একটি মেয়ে। মেয়েটি নির্মলার মত সুন্দরী নয় কিন্তু বয়েস সতরো আঠারো সিঁথিতে সিন্দুর।

নির্মলা পাকশালে রান্নাবান্নার তদারক করিতেছিল, নির্মল একেবারে সেইখানে উপস্থিত হইল। নব-বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'শোভা ইনি তোমার দিদি, এঁকে প্রণাম কর।'

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬